Vol. 35 | No. 1 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস

Volume	35
Issue	1
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আজিজুল হক
Published online	October 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v35i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i1.8
Pages	85-158
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস

সৈয়দ আজিজুল হক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর প্রতিভা;— যাঁর বিপুল জীবনাভিজ্ঞতা, জীবনানুসন্ধিৎসা ও বিজ্ঞানমনস্ক জীবনাগ্রহ মানব-মনস্তত্ত্বের বৈচিত্র্যময় গহন-গভীর ও ব্যঞ্জনাদীপ্ত প্রান্তসমূহ উন্মোচনের ব্যাপারে তাঁর সৃষ্টিশীল লেখনীকে যুগিয়েছে অফুরন্ত শক্তি, আবেগদীপ্ত প্রেরণা ও অজস্র উপাদান। ব্যবসাবৃত্তির অধঃপাত এড়িয়ে, সমগ্র সৃষ্টিশীলতার কাল জুড়ে দারিদ্র ও দুরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াইয়ে ব্যাপৃত থেকেও মাত্র আটাশ বছরের লেখকজীবনে তিনি-যে আটত্রিশটির অধিক উপন্যাস ও আড়াই শতাধিক গল্প রচনা করতে সমর্থ হন, তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এ-ও একটি কারণ যে, জীবনের সমগ্রতার প্রতি—বিশেষত মানবমনের বিচিত্র ও জটিল অবচেতন ক্রিয়ার প্রতি প্রায়-বাল্যবয়স থেকে এক সূক্ষ্মতর অন্তর্ভেদী শিল্পদৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতায় যে-বিচিত্র জীবনসত্যের সন্ধান তিনি লাভ করেন, জীবিকানির্বাহের তাগিদ ছাড়াও, তা উন্মোচনের এক তীব্র আন্তরগরজ তাঁকে তাড়িত করেছে সবসময়। একজন কথাসাহিত্যিকের, বিশেষত ঔপন্যাসিকের, শিল্পী হিসেবে সার্থকতালাভের প্রাথমিক শর্ত–যে জীবনের সমগ্রতা–সন্ধান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন সহজাতভাবে তা আয়ত্ত করেছিলেন। ফলে অনিবার্য সৃজন-আবেগে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমাজসতর্ক, রাজনীতিসচেতন ও মানবমনস্তত্ত্বসন্ধানী সৃষ্টি-প্রেরণার আন্তরগরজেই জাতীয় ভাবাবেগকে আত্মস্থ করে তিনি জীবনের মৃত্তিকামূলে আমৃত্যু সংলগ্ন থেকেছেন। সৃষ্টির প্রাচুর্যে–ভরপুর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিসত্তার পরিভ্রমণ–যে তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরে, তারও উৎসমূল নিহিত তাঁর এই ব্যতিক্রমধর্মী জীবনাগ্রহে। শিল্পী হিসেবে জীবনের রহস্য অনুসন্ধানের নিরবচ্ছিন্ন পথ-পরিক্রমায় কখনও

ফ্রয়েডীয় জীবন-অভীপ্সা, কখনও মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক জীবনদৃষ্টি— উভয়ই তাঁর শিল্পিমানসকে করেছে সমৃদ্ধ, গতিশীল ও আবেগময়। কিন্তু স্মরণীয় যে, কোনো ভাবাদর্শই তাঁর জীবনবোধ বা জীবনজিজ্ঞাসাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন কিংবা আবেগহীন করতে সক্ষম হয় নি। কারণ কোনো আদর্শের ফ্রেমবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তিনি জীবনের বৈচিত্র্যকে অনুধাবনের চেষ্টা করেন নি, বরং জীবনযন্ত্রণার চলমান আবেগচঞ্চল প্রাচুর্যের মধ্য থেকেই জীবনব্যাখ্যার নানা তত্ত্বকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে রাজনীতিতে সক্রিয় তাঁর জীবন–পরিধির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কন আবশ্যক।

১

১৯৪৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করার পর মৃত্যু (১৯৫৬) পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই দলের কর্মযজ্ঞে পুরোপুরি সক্রিয় ছিলেন।[১] তারুণ্যদীপ্ত বেপরোয়া জীবনে অভ্যস্ত স্বাধীনমনস্ক মানিকের এরূপ একটি ক্যাডারশৃঙ্খল বহুমতের প্রশ্রয়হীন দলে এতকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে সুস্থির থাকার ঘটনাটি বিস্ময়কর। নিজ জীবনের দারিদ্র, দ্বিতীয় মহাসমর ও বঙ্গভূমির মন্বন্তর (১৯৪৩) প্রভৃতি চেতনাজগতের তোলপাড়-করা ঘটনাবলি এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল বলে অনুমান করা যায়। কলেজজীবনে (১৯২৬–২৮) বাঁকুড়ায় দেশপ্রেমিক সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের (অনুশীলন) সংস্পর্শে এলেও সক্রিয় হন নি;[২] তবে সহানুভূতি-যে ছিল ওই কর্মকাণ্ডের প্রতি, তার প্রমাণ পরবর্তীকালের *জীয়ন্ত* (১৯৫০) উপন্যাস। এরপরে অনেক সময়ের ব্যবধানে রাজনৈতিক সম্পৃক্তির প্রথম ঘটনা প্রত্যক্ষ করি ১৯৩৭এ। ওই বছর প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত *প্রগতি* সংকলনে তাঁর *প্রকৃতি* শীর্ষক একটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩] ১৯৩৭-৩৮ সালে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় চাকরিসূত্রে ওই পত্রিকার মালিক সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যকে অত্যন্ত নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়ে একজন শোষক-বুর্জোয়ারচরিত্র সম্পর্কে মানিক নতুনতর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং এরই শৈল্পিক পরিণতি তাঁর দুই খণ্ডে প্রকাশিত *সহরতলী* (১৯৪০, ১৯৪১) উপন্যাস।[৪] ১৯৩৮ সালে তাঁর পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল বুখানিনের *ঐতিহাসিক বস্তুবাদ* ও লিয়েনতিয়েভের *মার্কসীয়অর্থনীতি* গ্রন্থদ্বয়।[৫] ওই সময়েই তিনি ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* উপন্যাসটি পড়েন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে।[৬]

অতঃপর তিনি ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে চাকরি নেন। চাকরিসূত্রে যুদ্ধবিরোধী

একাধিক বেতারভাষণ দিতে হয় তাঁকে; তাছাড়া মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক দলের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[৭] ১৯৪৩এর মন্বন্তরের সময় তিনি গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেন। মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত তাঁর *চিন্তামণি* উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৩এ ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের চাকরি ছাড়েন, অন্যদিকে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন।[৮] এই সংঘসূত্রে তাঁর কমিউনিস্ট পার্টিতে অন্তর্ভুক্তির পথ সুগম হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ (পরবর্তীকালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ) যতদিন সক্রিয় ছিল, ততদিন মানিকও ওই সংগঠনের কর্মচাঞ্চল্যে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। ১৯৪৪এর জানুয়ারিতে ওই সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে মানিক সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৪৪এর আগস্টে পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলন উপলক্ষে তিনি ঢাকা আসেন এবং ওই সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৫এর মার্চে সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনেও তিনি সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন পরিচালনায় সহায়তা করেন। ওই সম্মেলনে সংগঠনের নাম 'প্রগতি লেখক সংঘ' হিসেবে পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংঘের বঙ্গীয় শাখার অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সংঘের চতুর্থ সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং সম্মেলনে সম্পাদকীয় বিবরণী উপস্থাপন করেন। ওই সম্মেলন তাকে সংঘের সভাপতি নির্বাচিত করে। ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাঁরই সভাপতিত্বে। সংঘের কর্মপ্রবাহ বহু পূর্ব থেকেই স্তিমিত হয়ে এসেছিল; পঞ্চম সম্মেলনের পর তা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কার্যক্রমের সঙ্গে কিছুটা যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন নি এমন সময়ে কিংবা তারও আগে— কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলবশত কলকাতায় ওই দলের কমিউনধরনের জীবনপ্রণালী ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩) উপন্যাসে তার প্রতিফলন বেশ স্পষ্ট।[৯] কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই দলের সাংস্কৃতিক বিভাগের কর্মতৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হন। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজ ছাড়াও রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ-মিছিল-শোভাযাত্রায় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন।[১০]

১৯৪৫এর নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সদস্যের দণ্ড মওকুফের দাবিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ছাত্র মিছিলে পুলিস গুলিবর্ষণ করলে ছাত্র রামেশ্বরের মৃত্যু হয়।[১১] ধর্মতলার মোড়ে ছাত্র অবস্থানকে কেন্দ্র করে কলকাতার নগরজীবন দারুণভাবে আলোড়িত হয়। ১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ সদস্য রসিদ আলির মুক্তির দাবিতে অনুষ্ঠিত ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জনতাও যুক্ত হয়।[১২] ব্যক্তিগতভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন। এই আন্দোলনকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর *চিহ্ন* (১৯৪৭) উপন্যাস রচিত হয়েছে। *চিহ্ন* উপন্যাসে নিয়মিত মদ্যপায়ী অক্ষয়-যে ছাত্র অবস্থানের রাতে মদ খেতে পারে নি, তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই নিজ জীবনের ঘটনা। ওইদিনের পরে আরও কয়েকদিন মানিক মদ স্পর্শ করেন নি।[১৩] ১৯৪৬এর ১৩ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁর সঙ্গে বর্বর আচরণ করে। সেনাবাহিনী কর্তৃক রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কারের নির্দেশ অমান্য করলে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।[১৪] *চিহ্ন* উপন্যাসে এই ঘটনাটিরও উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসে কেরানি অজয় এরূপ ঘটনার শিকার হয়।

১৯৪৬এর মধ্য আগস্টে কলকাতায় তিনদিনব্যাপী ইতিহাসের যে-নিষ্ঠুরতম অমানবিক সাম্প্রদায়িক ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তা প্রত্যক্ষ করে শিল্পী মানিক কেবল ব্যথিতই হন নি, দাঙ্গা প্রতিরোধে সক্রিয় হয়ে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও লাভ করেন। দাঙ্গাকারীরা একদিন তাঁকে 'কমিউনিস্ট লেখক' ও 'মুসলমানের চর' বলে তাড়া করে।[১৫] এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে পটভূমি করে তিনি রচনা করেন *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১)।

১৯৪৬এর সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং ১৯৪৭এ স্বাধীনতার নামে দেশবিভাগের ফলে বঙ্গভাষী অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক লোক উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে-যাওয়া লোকসমাগমে উপচে পড়ে কলকাতা শহর। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুভূত হয়। কলকাতার শহরতলীতে বসবাসরত মানিক অত্যন্ত নিকট থেকে উদ্বাস্তু সংকট প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। জন্মভূমি থেকে উন্মূলিত মানুষেরা অস্তিত্বসংকটের মুখোমুখি হয়ে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের অলঙ্কার ত্যাগ করতে কিভাবে বাধ্য হয়, তারই অন্তর্বেদনার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে *সার্বজনীন* (১৯৫২) উপন্যাসে।

অতঃপর স্বাধীন দেশে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়। বিরোধীদের দমনের ব্যাপারে সকল শাসকশক্তিরই যে একই বৈশিষ্ট্য, দেশশাসনের সুযোগ পেয়েই ভারতীয় কংগ্রেস তার পরিচয় দিতে থাকে। ১৯৪৭এর আগস্টে ক্ষমতাগ্রহণের তিনমাসের

ব্যবধানেই নভেম্বরে উত্থাপিত হয় 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' বিল। এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। মানিকসহ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ১৯৪৭এর ডিসেম্বরে ওই বিল প্রত্যাহারের দাবি করে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।[১৬] ১৯৪৮এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রস্তুতি হিসেবে এর কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্মেলনে যে সাংস্কৃতিক সাব-কমিটি গঠিত হয় মানিক তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি ও নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে। সদ্য স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সংঘটনের স্বপ্ন দেখে এবং সে-অনুযায়ী এক অবাস্তব নীতি গ্রহণ করে। অন্যদিকে স্তালিনীয় সোভিয়েত রাষ্ট্রে এর আগেই সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক সামরিক নীতি প্রয়োগ করা হয়। ফলে তার নেতিবাচক প্রভাব ভারতের প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীদের ওপরও পড়ে। এরই পরিণতিতে ভারতের মার্কসীয় ভাবাদর্শ-অনুসারী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শুরু হয় অনাকাঙ্ক্ষিত এক তীব্র ঝাঁঝালো বিতর্কের। ১৯৪৭এর শেষ পর্যায়ে শুরু হয়ে এই বিতর্ক প্রলম্বিত হয় ১৯৫০ সাল পর্যন্ত— যতদিন-না আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন কর্তৃক ভারতীয় নীতিকে ভুল বলে আখ্যায়িত করা হয়। বিস্ময়কর যে, বিপ্লবের রণনীতি গ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা যখন সরকারের তীব্র দমননীতির শিকার, ওই দলের কৃষক ফ্রন্টের কর্মীরা যখন তেভাগার দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনা করে ফসলের মাঠ রক্তাক্ত করছে— ঠিক তখন কলকাতাকেন্দ্রিক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা তাত্ত্বিক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পরস্পরের মাথা চিবোচ্ছেন। তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়েন ওই বিতর্কে। দলীয় নির্দেশের নামে দলীয় নেতাদের রূঢ় আচরণে তাঁর শিল্পী-হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে।[১৭] তিনি লক্ষ্যবস্তু হন ত্রিমুখী আক্রমণের। প্রথমে উগ্রপন্থী বলে, মধ্যপর্যায়ে উগ্রপন্থী নন বলে এবং শেষে আবার উগ্রপন্থী হিসেবে আক্রমণের শিকার হন তিনি।[১৮] বিতর্কে জড়িয়ে মানিক যে তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন, তার প্রথমটি 'পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনা' শিরোনামে বের হয় ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৪৮এ এবং 'বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শিরোনামে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে জানুয়ারি ও আগস্ট ১৯৫০এ।

১৯৪৮ সালে মানিকের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের *লিটারেচার অ্যান্ড আর্ট*, সিডনি ফিঙ্কেইসটেইনের *আর্ট অ্যান্ড সোসাইটি*,

ক্রিস্টোফার কডওয়েলের *ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটি* প্রভৃতি গ্রন্থ।[১৯] ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় ছাত্র মিছিলে পরপর কয়েকদিন পুলিস গুলি চালালে চারজনের মৃত্যু হয়। মানিক ওই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে 'মানবতার বিচার' শীর্ষক নিবন্ধ লেখেন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিস শহরে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংযোগ সমিতি ও আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রী নারী সংঘ যুগ্মভাবে একটি বিশ্বশান্তি সম্মেলন আহ্বান করে। ওই সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে মুলকরাজ আনন্দ, কৃষণ চন্দর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে আন্নাভাও শাঠে ও ওমর শেখ আমন্ত্রিত হন। কিন্তু সরকার তাদের প্যারিসগমনের ছাড়পত্র দেয় নি।[২০] বিপ্লবের রণনীতিগ্রহণের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি যখন সরকারি দমননীতির শিকার, কমিউনিস্ট লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বহু প্রকাশক ও পত্রিকার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।[২১] ১৯৪৯ সালের ২৮ জুন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় লেখকদের এক সভা অনুষ্ঠানের পর মিছিল বের হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন, মিছিলে পুলিস গুলিবর্ষণ করলে একজন নিহত হয়।[২২] ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে সারাভারত শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। সরকারি বাধাসৃষ্টি সত্ত্বেও সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সম্মেলনে সোভিয়েত লেখক টিকোনভের অংশগ্রহণের কথা থাকলেও ভারত সরকারের বাধাপ্রদানের কারণে তিনি পাকিস্তান পর্যন্ত এসে ফিরে যান। ১৯৪৯ সালে তাঁর পাঠ্যতালিকায় একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় : স্তালিন রচিত *মার্কসিজম অ্যাণ্ড দি ন্যাশনাল কোশ্চেন* ।[২৩]

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ রচনারও যেন কাকতালীয় যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'কেন লিখি' বের হয় ১৯৪৪এ। তারপর মৃত্যু পর্যন্ত মোট তেইশটি প্রবন্ধ রচনার সন্ধান মেলে। এর মধ্যে রাজনীতিসম্পর্কিত প্রবন্ধের সংখ্যা এগার। ইতোমধ্যে বিতর্কমূলক তিনটি ও ছাত্রমিছিলে গুলির প্রতিবাদে রচিত একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি লেখেন : 'প্রেস মালিকদের ষড়যন্ত্র' (১৯৪৭), 'প্রগতি সাহিত্য' (১৯৪৯), 'সাহিত্যিক ও গুণ্ডামি' (১৯৪৯), 'বক্সা ক্যাম্পে শিল্পী-সাহিত্যিক' (১৯৫০), 'কলকাতায় স্বাধীনতা দিবস' (১৯৫১), 'মহামানব স্তালিন' (১৯৫৩) ও 'সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ' (১৯৫৩)।

১৯৪৭-৫০এর প্রায় তিন বছরকালের মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্কে অনেক

সত্য ও অসত্যের, অনেক যুক্তি ও কুযুক্তির ব্যাপক অনুশীলনের পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে পূর্বেকার পারিবারিক-প্যাটার্নের চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে বেশ সময় লাগে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিল্পিমেজাজের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ এমন অনেক রূঢ় আচরণের সম্মুখীন হয়েও দলের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য এবং আদর্শের প্রতি আস্থা অব্যাহত রাখেন। ১৯৫১ সাল থেকে তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে; এবং ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সাল— মৃত্যুপূর্ব এই তিন বছরকাল তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। ১৯৫৫ সালে দুবার হাসপাতালে যেতে হয় তাঁকে। সুতরাং ওই সময়ে তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তার ইতিহাস তেমন ব্যাপক নয়। তবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও কৌতূহলে কোনো ছেদ পড়ে নি। ১৯৫৫ সালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনকালে অন্ধ্র প্রদেশের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ভরাডুবি নিয়ে মানিকের মধ্যে যে দুশ্চিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণপ্রিয়তা লক্ষ করি তা নিজ দলের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ও আন্তরিকতারই নিদর্শন।

২

সহরতলী উপন্যাসে মানিকের রাজনীতিসচেতনতা প্রথম স্পষ্টভাবে অনুভব করা গেলেও এটি পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিজীবনে ফ্রয়েডীয় ভাবনার প্রাধান্য থেকে মার্কসীয় দর্শনে উত্তরণের যে-প্রয়াস স্পষ্টত লক্ষ্যসাধ্য, সেই পরিবর্তনের প্রথম চিহ্নকে ধারণ করেছে এ-উপন্যাস। যৌনতাড়নাই মানুষের একমাত্র নিয়তি নয়, মানুষের জীবনে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী কিংবা প্রজননের চেয়ে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ— এ উপলব্ধিই শিল্পরূপ লাভ করেছে *সহরতলী*-তে। *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র (১৯৩৬) গোপাল কিংবা *পদ্মা নদীর মাঝি* (১৯৩৬) উপন্যাসের হোসেন মিয়ার পর *সহরতলী* উপন্যাসে 'সত্যপ্রিয়' নামে এমন একটি শোষক-চরিত্র তিনি আঁকলেন, যে-চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে নতুন, সর্বাংশে শহুরে বুর্জোয়া। এ-চরিত্র সম্পর্কে মানিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ইতিহাস আমরা *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় তাঁর চাকরিসূত্রে জানি। 'গোপাল' কিংবা 'হোসেন মিয়া' সম্পর্কে মানিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ইতিহাস আমাদের অজানা। কিন্তু অনুমান করে নিতে পারি, যখন তিনি ওইসব চরিত্র প্রত্যক্ষ করছেন তখন তাঁর বয়স ও দৃষ্টির সজাগতা (তীক্ষ্ণতার কথা বলছি না)— উভয়ই তুলনামূলকভাবে কম। বলা নিষ্প্রয়োজন, এসব কারণেই সত্যপ্রিয় অনেক বেশি স্পষ্ট ও বাঙ্ময় হতে পেরেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল প্রতিরোধকে পুরোপুরিভাবে নির্মূল করার ক্ষেত্রে যে সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী কৌশল সে গ্রহণ করে তাতেই তার চরিত্রের নিষ্ঠুর অমানবিক বৈশিষ্ট্য এবং মুনাফালোভের ভয়ঙ্কর কদাকার দিকটি প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। এবং মানিক অত্যন্ত বড়ো প্রতিভার অধিকারী বলেই শোষকশ্রেণীর অমানবিকতাকে কেবল শ্রমিকদমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি দেখাতে চেয়েছেন, শোষকচরিত্রের এই নিষ্ঠুরতা এমনই রক্তনিহিত–যে তা পুত্র-কন্যা-জামাতার বিদ্রোহদমনেও সমানভাবে প্রযুক্ত হয়।

মানিকের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস *প্রতিবিম্ব* ।২৪ *সহরতলী* উপন্যাসের মতো এ-উপন্যাসও সমসাময়িক বিষয় অবলম্বনে রচিত। উপন্যাসের ঘটনাকাল ও রচনাকালের ব্যবধান খুব বেশি নয়। যুদ্ধকালীন সময়ে বেকারদের একমাত্র ভরসা যুদ্ধের চাকরি, দুর্ভিক্ষের সময়ে ক্ষুধার্তদের শহর-অভিমুখী মিছিল, ত্রাণতৎপরতা পরিচালনা, কলকাতার ফুটপাতে অনাহারী নারীর মৃত্যু, গ্রামে যুবতী নারীর বস্ত্রসংকট প্রভৃতি প্রসঙ্গ এ-উপন্যাসে উত্থাপিত হয়েছে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, ১৯৪২-৪৩এর ঘটনা এসব। অন্যদিকে এ উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৪৩এর শারদীয়া *যুগান্তর*–এ। কোনো মহকুমা শহরসংলগ্ন গ্রামের শিক্ষিত, রাজনীতিসচেতন, সকল প্রকার বাধাবন্ধনহীন স্বাধীন জীবনাকাঙ্ক্ষী এক বেকার যুবকের কাহিনী এটি। তাছাড়া বাস্তবতার সঙ্গে ভাবপ্রবণতার দ্বন্দ্বও এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে যুবক তারকের দৃষ্টিতে একটি বামপন্থী দলের রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নীতি–আদর্শের স্বরূপসন্ধান করতে গিয়ে কখনও তার প্রশংসা, কখনও ব্যঙ্গ, আবার কখনও তার অন্তঃসারশূন্যতার মুখোশ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি ও ন্যাকামি, বিকার ও ভাবপ্রবণতাকে পুরোপুরিভাবে উপেক্ষা করে ওই রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কমিউনব্যবস্থায় বসবাসের মাধ্যমে আরেক ধরনের বিকারহীন অবাস্তব ভাবালুতাকে যেন আশ্রয় করেছে—এটাই লেখক দেখাতে চেয়েছেন।

পত্রিকায় প্রকাশের পর উপন্যাসটি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কটাক্ষ করে রচিত হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মানিক গ্রন্থের শুরুতে 'লেখকের বক্তব্য' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করে উত্থাপিত অভিযোগগুলি খণ্ডন করেন। তাঁর ভাষায়, কোনো একটি বিশেষ পার্টির সপক্ষে বা বিপক্ষে বা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাহিনী রচিত হয় নি। তবে তিনি স্বীকার করেন যে,

"প্রতিবিম্বের কোন কোন অংশকে ভিত্তি করে কারো কারো পক্ষে কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব যে অমুক পার্টির সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে।" তিনি আরও স্বীকার করেন, "উদ্দেশ্য না থাকলেও লেখার মধ্যে খোঁচা— সোজা বা তেরচা যেমন হোক— থেকে যেতে পারে। এবং সে খোঁচা যে সব সময় অবান্তর হবে এমন কথাও নেই।" মানিক এ-উপন্যাস রচনার পেছনে তাঁর নিজ "মনের বিব্রত দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার আপেক্ষিক সঞ্চরণশলীতা"কেই মূলত দায়ী করেন।

উপন্যাসে যে-রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তা ১৯৪২-৪৩এরই। এবং যে-রাজনৈতিক দলের 'কনফারেন্সের' কাহিনী বিবৃত হয়েছে, সে-দলটিকে কমিউনিস্ট পার্টি বলে অনুমান করতেও কষ্ট হয় না। তাছাড়া বিশেষ একটি দলের বিরুদ্ধে না হলেও এমন কিছু রাজনৈতিক ভাবপুঞ্জ (আইডিয়া) সম্পর্কে তাঁর বিব্রত মনের সমালোচনা এ-উপন্যাসে ভাষালাভ করেছে, যার অধিকারী এ-দেশের কমিউনিস্টরাই। স্মরণীয় যে, ১৯৪২এর আগস্টে ভারতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' নীতি গ্রহণ করে তা কার্যকর করার জন্য উদ্যোগী হলে ওই দলের নেতারা কারারুদ্ধ ও নানারূপ দমন-পীড়নের শিকার হন। অথচ ওই সময়েই (জুলাই ১৯৪২) দীর্ঘকাল যাবৎ নিষেধাজ্ঞা-পীড়িত কমিউনিস্ট পার্টি বৈধভাবে কর্মতৎপর হওয়ার সুযোগলাভ করে।[২৫] এর কারণ, হিটলার-আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীজোটে আবদ্ধ হলে, সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিশীল এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সাময়িকভাবে ব্রিটিশ-বিরোধিতা স্থগিত রাখে এবং যুদ্ধবাদী জার্মান-জাপান-ইতালি অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে জনমতগঠনে মনোযোগী হয়। আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত কমিউনিস্ট পার্টি উপরিউক্ত যে-রণকৌশল গ্রহণ করে, তা দ্বারা ভারতীয় কংগ্রেসকে প্রভাবিত করারও প্রয়াস পায়। *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসে 'কনফারেন্স'-উদ্যোক্তাদের প্রস্তাবে এরূপ প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মেলে। যেমন, "কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করে, কংগ্রেসের আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার ও জেলের বাইরে এসে নতুন নীতি গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে দেওয়াই প্রস্তাবের মূল কথা।"[২৬]

লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্টদের এরূপ আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে তখনও পর্যন্ত সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখছেন। এর কারণ সম্ভবত এই, ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে কংগ্রেস যখন তীব্র নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার, ঠিক তখনই কমিউনিস্ট পার্টি আট বছরের নিষেধাজ্ঞার বলয় থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগলাভ করে। দীর্ঘদিন

ধরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত ভারতবাসীর নিকট এই রাজনৈতিক দৃশ্যপটটি সহজপাচ্য হয় নি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কমিউনিস্ট পার্টির ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামশীলতা যত যথার্থই হোক, ওই সংগ্রামস্রোতে দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের আকৃষ্টকরণে কমিউনিস্ট পার্টি যত সফলই হোক- অনস্বীকার্য যে, জাতীয় রাজনীতির বিবেচনায় এর ফলে ওই দল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এই সংগ্রামপ্রবাহের মূল শক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্টদের দূরত্ব বেড়েছে; অন্যদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস।[২৭] জাতীয় জীবনের মূল সংকটকে উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়ার প্রয়াস মানিকের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসে নিশীথের কণ্ঠে মানিকের এই মনোভাবই উচ্চারিত হয় :

> ... তোমাদের কি হয়েছে জানো, সোভিয়েট নেতাদের দৃষ্টি দিয়ে দেশকে দেখছ। রাগ করো না, একটা উপমা দিচ্ছি। ইংরেজীপনা একদিন যেমন আমাদের মধ্যে মত্ততা এনেছিল, তোমাদেরও তেমনি রুশপনার মত্ততা এসেছে! এখনো স্বদেশীপনার রূপ দিতে পার নি, জাতি না হয়েই আন্তর্জাতিকতার মন্ত্র জপছ। মস্কো থেকে ইংলন্ড হয়ে ভারত হয়ে একটা তার মস্কোতে পৌঁচেছে— এই হল তোমাদের আন্তর্জাতিকতার রূপ।...[২৮]

এই পর্যায়ের রাজনীতিভাবনায় মানিকের কাছে আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী চেতনাই অধিক গুরুত্বলাভ করে। মানিক আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় সমস্যাকে চিহ্নিত করার পরিবর্তে জাতীয় সংকট সমাধানের মনোভঙ্গি দ্বারা চালিত হয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাকে পরিমাপ করতে আগ্রহী। আন্তর্জাতীয়তার পরিবর্তে অন্তর্জাতীয় চেতনাপুষ্ট তারকের ভাবনাস্রোতে তাই মানিকের আরও সংযোজন :

> ... প্রোডাকসন, ডিস্ট্রিবিউসন, ক্যাপিটালিস্ট সীস্টেম, সোস্যালিস্ট সীস্টেম ইত্যাদি সব জলের মত পরিষ্কার তার কাছে— অথচ দেশকে সামনে রেখে ভাবতে গেলে সব তথ্যবোধ তার গুলিয়ে যায়। বিদেশী বণিকের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা স্বদেশী বণিকের করায়ত্ত হতে দিতে তারকের আপত্তি নেই, কিন্তু তাও সম্ভব হবে একমাত্র সোসালিস্ট রাষ্ট্র গঠনের আয়োজন থেকে উদ্ভূত বিপ্লবের মারফতে । সে স্বাধীনতার মূল্য তারকের কাছে খুব বেশী নয়। তবু সে স্বাধীনতাই ক্যাপিটালিস্ট বৃটেনকে দুর্বল করবে, ভারতে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস সহজ হবে এবং তারক বিশ্বাস করে ভারতকে সোজাসুজি সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টার চেয়ে এই পন্থায় সেটা

অনেক সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে হবে।[২৯]

বলা বাহুল্য, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পর মানিক এই মনোভাব থেকে সরে এসেছিলেন। যাই হোক, শুধু রাজনৈতিক নীতির প্রশ্নে নয়, কমিউনিস্টদের বিশেষ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে সমালোচনামুখর। বিশেষ রাজনৈতিক দলটির মহকুমাপর্যায়ের নেতা রামবাবু দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে ত্রাণতৎপরতায় সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানালে তারক এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকার যে-যুক্তি দেয় তা রাজনৈতিক হঠকারিতারই নামান্তর। বামপন্থীদের কোনো কোনো অংশের মধ্যে এমন একটি ধারণা সবসময় সক্রিয় যে, আর্থ-সামাজিক সংকটকে তীব্র হতে দিলে বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে তারা সংগঠিত হবে এবং পরিণতিতে ওই সংকট দূর করা সহজ হবে। তারকের কণ্ঠে এরূপ কুযুক্তিপূর্ণ চিন্তাই প্রতিধ্বনিত হয়, যখন সে বলে : "ভাল করে দুর্ভিক্ষ হোক। লোক মরুক"; কিংবা, "আপন জন মরছে, নিজে মরতে বসেছে, মানুষ মরিয়া হবে না! কি যে বলেন!"[৩০] মানুষ ক্ষুধার্ত হলেই কিংবা মরণাপন্ন হলেই-যে প্রতিবাদী বিদ্রোহী হয় না, হয় না রাজনীতিসচেতন—এজন্য যে-প্রয়োজন বিশেষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিধিতে তারসংযুক্তি— সেই বিবেচনাবোধের অভাব রয়েছে তারকের ভাবনাপুঞ্জে।

বামপন্থী দল ও গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হলো : তারা তত্ত্বের অশুদ্ধতা-বিশুদ্ধতা নিয়ে, নীতিনির্ধারণের অনুপুঙ্খতা নিয়ে যত সময় ব্যয় করে তা কার্যকরকরণের লক্ষ্যে বাস্তবজীবনে তত সক্রিয় হয় না। বামপন্থীদের এরূপ কর্মপদ্ধতিকেও তীব্র বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন মানিক। 'কনফারেন্সে'র প্রস্তাব-রচয়িতাদের আলোচনা শুনে তারকের মনে হয় : "শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ নিয়ে পাঁচজনে যেন মুখে মুখে ডক্টরেটের থিসিস তৈরী করছে।"[৩১] একই কারণে কাজের প্লান ছাড়া শুধু একটি প্রস্তাবগ্রহণের জন্য অর্থব্যয় করে কনফারেন্স আহ্বানকে তারকের কাছে অর্থহীন বলে বিবেচিত হয়। তারক বলে, "আপনারা যে কংগ্রেসের নীতি সমর্থন করেন না, জেলের বাইরে থেকে আপনাদের কাজ করাটাই তার মস্ত প্রমাণ। পলিসি জোর গলায় ঘোষণা করলেই লোকে বুঝবে কংগ্রেসের পলিসি আপনারা মানছেন না। একটা উদ্দেশ্যহীন কনফারেন্স ডেকে লাভ কি?"[৩২] তাছাড়া, "তারক বুঝতে পারে না কংগ্রেসকে বাইরে আনতে এত ব্যস্ত কেন এরা, এত অধীর কেন? এরা কেন অবাস্তব অর্থহীন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে বর্তমানে?"[৩৩] বামপন্থীরা নিজেদের জনসমর্থনের স্বল্পতা বিবেচনা করে জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে নিজেদের নীতি কার্যকর

করতে আগ্রহী হয়। লেখক এরূপ কর্মকৌশলের সমর্থক নন বলেই এ-বিষয়টি তারকের নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়।

উপন্যাসে উল্লেখিত বিশেষ রাজনৈতিক দলটির কমিউনপদ্ধতির বসবাস ও আচরণধারার মধ্যেও মানিক প্রত্যক্ষ করেছেন নানা ত্রুটি ও ফাঁকি। নারী ও পুরুষকর্মীদের একত্রবাসের ক্ষেত্রে প্রচলিত সংকোচ ও পরিবারজীবনের নিয়ম নিয়ন্ত্রণের সকল দেয়াল তারা ঘুচিয়ে দিয়েছে। হিংসা, বিদ্বেষ, মনোজটিলতা, রাগ-অভিমান, অপরিচিতের দ্বিধা ও সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতা সব কিছুকে তারা সমাধিস্থ করেছে পরস্পরের সহকর্মীসুলভ আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার শক্তি দিয়ে। যেমন, "অনাবশ্যক পরিচয় কেউ করিয়ে দেয় না, আবার অকারণে কেউ আলাপ-পরিচয় করে এমনভাবে যেন জের টানা হচ্ছে বহু পুরানো বন্ধুত্বের, নাম-ধামটা জানাই শুধু বাকী ছিল।"[৩৪] এমনকি নারী ও পুরুষকর্মীর দেহগত আবেগকেও তারা ভাইবোনের মধ্যেকার যৌনমুক্ত সম্পর্কের দৃষ্টান্তসহযোগে অস্বীকার করতে চায়। যেমন, একঘরে নারী-পুরুষ বহুকর্মীর রাত্রিবাসকালে সকলকে নিদ্রামগ্ন ভেবে সীতানাথ মনোজিনীকে জড়িয়ে ধরে প্রণয়সম্ভাষণ করলেও বিষয়টি মনোজিনীর কাছে তুচ্ছই মনে হয়। মনোজিনীর ভাষায়, "পেটের ক্ষিদেয় কাতর হয়ে আমার কাছে খাবার চাইলে যত তুচ্ছ মনে হত, প্রায় সেরকম তুচ্ছ।"[৩৫] এ প্রসঙ্গে মনোজিনী নারী ও পুরুষকর্মীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তাদের দলীয় মনোভাব ব্যক্ত করে এভাবে :

> ... আমাদের মেলামেশায় সব কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙ্গে দেওয়া হয়, কাজে-কর্মে-চলাফেরায় সময়ে অসময়ে সব অবস্থায় সব সময় সমানভাবে আমরা মেলামেশা করি। ঠিক এইজন্যই বাইরে আমাদের বদনাম রটে কিন্তু আসলে এইজন্যই সমাজের উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত সমস্ত স্তরের চেয়ে আমাদের মধ্যে বিকার কম, অসংযম কম। আজকের কাণ্ড দেখে কথাটা আপনার বিশ্বাস করা কঠিন হবে, কিন্তু সত্যি কথাই বলছি আপনাকে। ভাইবোনের মধ্যে যৌন আকর্ষণ হয় না কেন আপনি নিশ্চয় জানেন। আমাদের মধ্যেও অনেকটা তাই ঘটে। মেলামেশায় যদি আমাদের বিধিনিষেধ আইন-কানুন থাকত, তাহলে মেয়েরা যেমন পুরুষরা তেমনি সর্বদা সচেতন হয়ে থাকত পরস্পরের সম্বন্ধে, সেই চেতনা থেকে মোহ জন্মাত, কামনা জাগত। কিন্তু সর্বদা খোঁচা দিয়ে যৌন চেতনাকে জাগিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা আমরা বাতিল করে দিয়েছি। তাছাড়া, আমরা সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি, মস্ত একটা উদ্দেশ্য আছে আমাদের, দু'দণ্ড বসে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার অবসরও আমাদের জোটে না। ...[৩৬]

এরূপ চিন্তা ও বিশ্বাস মানিকের কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, বরং এসব আদর্শবাদিতার মধ্যে তিনি একপ্রকার অবাস্তব ইউটোপীয় ভাববিলাস খুঁজে পান।

উপন্যাসের নায়ক তারকের ভাবনায় মানিকের এই সমালোচনাই মূর্ত হয়ে ওঠে। তারক ভাবে, "উদ্ভট খাপছাড়া মানুষ এরা, এরা সবাই এক একটা কুষ্মাণ্ড। কিছু হবে না এদের দ্বারা। ফাঁকা বিনয় আর বাড়াবাড়ি ভদ্রতা বাদ দিতে গিয়ে এরা মানুষের সঙ্গে ফাঁক সৃষ্টি করছে।"[৩৭]

প্রতিবিম্ব উপন্যাসে মানিক যে-নীতি-আদর্শ ও সাংগঠনিক সংস্কারশৃঙ্খলের অন্তঃসারশূন্যতা উন্মোচন করেন, বিস্ময়কর যে, অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে তিনি নিজেকেই ওই মতাদর্শের বন্ধনে জড়িয়ে ফেলেন। এ উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, উপন্যাসের নায়ক তারকের আচরণ ও বক্তব্যে মানিক নিজেকেই অনেকটা প্রতিবিম্বিত করেছেন। সেদিক থেকে উপন্যাসটির নামকরণ যথার্থ ও সার্থক। মানিক তাঁর মনোভাবগত পরিবর্তনের কথা উপন্যাসের শুরুতে 'লেখকের বক্তব্য' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন এভাবে : "বলা বাহুল্য, তারক বদলে যাবে। কিছুটা বদলেছে ইতিমধ্যেই। কিছুকাল পরে 'প্রতিবিম্ব' হয়ে যাবে 'পুরানো ছবি'।'' মানিকের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা এ-বক্তব্যের সত্যতা অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। সত্যসত্যই *প্রতিবিম্বের* র মানিককে আর আমরা পাই না। তারক–চরিত্রে মানিকেরই যে-প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে, তার আরও একাধিক প্রমাণ উপন্যাসমধ্যে বর্তমান। যেমন, তারক 'বন্ধনভীরু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয়।' তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই সে রামবাবুর বামপন্থী দলটির কর্মযজ্ঞে মাঝেমধ্যে জড়িত হলেও দলীয় সদস্যপদগ্রহণে সর্বদা আপত্তি প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে প্রশাসনিক বন্ধনের ভয়ে চাকরিগ্রহণেও সে অনাগ্রহী। বন্ধন–অসহিষ্ণুতা তার মধ্যে এমনই প্রবল যে, চাকরির আবেদনপত্র প্রেরণের নামে বছরের পর বছর সে পিতার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, নিশ্চিত চাকরির সুযোগ হারিয়েছে মূর্খের অভিনয় করে, পিতামাতাস্ত্রীর নিকট মিথ্যা হৃদরোগের কথা প্রচার করেছে। শ্বশুরের সংগ্রহ করে দেওয়া একটি সুনিশ্চিত চাকরির নামমাত্র সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হয়ে তারক ভাবে : "চাকরী করবে, পার্টিতে থাকবে, বৌকে আনবে, আত্মীয়কে খুশী করবে, এ যে চারতলা জীবন হবে তার?— রাজা, গোলাম, বিবি এবং টেক্কার তাস দিয়ে গড়া জীবন!"[৩৮] এ-যেন শিল্পী মানিকেরই অন্তর–কথা। এ-উপন্যাস রচনার পূর্বে মানিক দুটি চাকরি করেছেন– *বঙ্গশ্রী* পত্রিকা ও ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে— পরে আর কোনো চাকরি তিনি করেন নি। জীবনে যে দুটি চাকরি করেছেন, তা নিতান্তই অনিচ্ছা ও অনাগ্রহের সঙ্গে এবং চাকরির অভিজ্ঞতাও তাঁর জন্য সুখকর হয় নি। সুতরাং মনে যে-বিতৃষ্ণা জন্মেছিল, তারকের চাকরিগ্রহণে অনাগ্রহের

মধ্যেই যেন তার প্রকাশ ঘটেছে। এছাড়া *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসে তারকের অগ্রজের যে-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সঙ্গে মানিকের আবহতত্ত্ববিদ জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাযুজ্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। তারকের অগ্রজ হাজার টাকা মাইনের চাকুরে, পিতামাতাকে ছেড়ে শুধু স্ত্রীকে নিয়ে আট-নশো মাইল দূরে থাকেন, পিতার দুতিনবারের পত্রাঘাতের ফলে কিছু টাকা পাঠালেও মনিঅর্ডারের কুপনে তারকের বেকারজীবনের অন্নধ্বংস নিয়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন। অথচ তারক তাকে চাকরি খুঁজে দিতে বললে বা ব্যবসাকাজে হাজারখানেক টাকা দাবি করলে নানা অজুহাতে তিনি তা এড়িয়ে যান। সে-কারণে মানিকের মতোই তারক তার দাদাকে পত্র লিখে উপদেশ দেয়, বাপের সঙ্গে ছলনা করা তার মতো মহানুভব ব্যক্তির অনুচিত।

চাকরির ইন্টারভিউসূত্রে দুদিনের জন্য কলকাতা গিয়ে তারক সোভিয়েতপন্থী একটি রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থেকে নতুন যে-রাজনৈতিক দৃষ্টিলাভ করে, তাতে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষকে আবার নতুনভাবে দেখার ও তাদের জীবনবৈশিষ্ট্যকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার আগ্রহ জাগে তার মনে। উপন্যাসশেষে তারক বলে, "আবার আসব। মাঝে মাঝে আসতেই হবে। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, সংশোধন করে আসি। ... দেশের পরিচিত চাষী-মজুরগুলোকে একবার চিনে আসতে হবে। ... আমি সত্যি ওদের ভাল করে জানি না। প্রতিদিন ওদের জীবনযাত্রা দেখেছি, এক সঙ্গে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করেছি কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক ছিল একটা। ... আমার বাড়ির কাছে জৈনুদ্দিনের ঘর, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত বোধ হয় লাখখানেক কথা ওর সঙ্গে আদান-প্রদান হয়েছে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখছি লোকটা কি ভাবে, কেমন করে ভাবে, কিছুই জানি না। মানুষগুলোকে একটু চিনে আসি।"[৩৯] কংগ্রেসের প্রতি প্রীতিস্নিগ্ধ, জাতীয়তাবাদী চেতনাপুষ্ট তারকের শ্রমজীবী জীবনাগ্রহই উপন্যাসের শেষাংশে বড়ো হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবাদী তারকের শ্রেণীদৃষ্টি অর্জনের আলেখ্য রচনাই এ উপন্যাসের মূলকথা। তারকের মতো মানিকও এরপর থেকে শ্রেণীদৃষ্টির আলোকে নতুনভাবে পরিশ্রমজীবীর শক্তি ও সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করবেন। *প্রতিবিম্ব*-পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে আমরা মানিকের এই নতুন আবিষ্কারসমূহই প্রত্যক্ষ করব। পাশাপাশি স্বীকার্য যে, বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের বাস্তবতায় বিচার করলে *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসে উত্থাপিত শিল্পী মানিকের অনেক সমালোচনাপূর্ণ উপলব্ধিকেই যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে,

পরবর্তীকালে মানিক নিজেই তাঁর অবস্থান থেকে সরে গিয়ে শিল্পীর সত্যদৃষ্টিকে অস্বীকার করেন।

৩

প্রতিবিম্ব রচনার সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন নি। ফলে *প্রতিবিম্বে* শিল্পী মানিকের যে অস্পষ্টতা, দ্বিধা, বিব্রত মনের বঙ্কিম চলনভঙ্গি কিংবা রূপকের আবরণসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ করি, তা থেকে দ্বিতীয় রাজনৈতিক উপন্যাস *দর্পণ* (১৯৪৫) অনেকটা মুক্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রায় তিনবছর পূর্বে (১৯৪২) এ-উপন্যাসের কিয়দংশ পাটনার *প্রভাতী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও *দর্পণ* প্রকৃতপক্ষে মানিকের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পরবর্তীকালেরই সৃষ্টি।[৪০] অবশ্য মানিকের জীবন-আলোচনা থেকে এ-উপন্যাস রচনার পেছনে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেরণা সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না। অথচ এ-উপন্যাসেই মানিক শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে সমন্বিত করার মধ্য দিয়ে প্রথম স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তার স্ফুরণ ঘটাতে সক্ষম হন। শহরের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামের কৃষকসমাজের সংগ্রাম এক মোহনায় মিলিত হয়ে নতুন তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি না করলে তা সফল পরিণতি অর্জনে সমর্থ হবে না— রাজনীতির এ-বিজ্ঞানসত্যটি সূচনালগ্নেই মানিকের শিল্পিচেতনায়–যে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে ছিল, এ-উপন্যাসই তার প্রমাণ। *প্রতিবিম্বে*র পরে *দর্পণ* নামকরণটিও তাই এদিক থেকে সার্থক। প্রসঙ্গত রণেশ দাশগুপ্তের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণ' জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের শিল্পরূপ দর্পণ হিসেবে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে আলাদা এদিক দিয়ে যে, 'গণদেবতা'র মতো 'দর্পণ'ও মুক্তিসংগ্রামে উৎসর্গিত বিপ্লববাদীদের চরিত্রে যত আলো ফেলে তাদের বীরত্বকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছে, তার চেয়ে বেশী আলো ফেলেছে নিতান্ত সাধারণ ও তথাকথিত সামান্য মানব–মানবী চরিত্রে, যারা গ্রামবাংলা আর সহরতলীর মেহনতী মানুষদের চাপা–পড়া স্তর থেকে বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আবার 'দর্পণ' উপন্যাসটি 'পথের দাবী' ও 'গণদেবতা' থেকে আলাদা এদিক দিয়ে যে, 'দর্পণ' জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চল্লিশের দশকের বিপ্লবাত্মক শ্রমিককৃষক মৈত্রীর যোগসূত্র স্থাপনের উপন্যাস।[৪১]

শ্রমিকবস্তিতে রাজনৈতিক তৎপরতা ও শ্রমিক সংগঠনের চিত্র *পথের দাবী*

(১৯২৬) উপন্যাসে অঙ্কিত হলেও জাতীয়তাবাদী চরিত্রই ওই রাজনীতির মূল প্রেরণা। ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদী দেশপ্রেমিক আন্দোলনই *পথের দাবী* র ভাবাকাশকে সমৃদ্ধ করেছে। *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *গোরা* (১৯০৯), *ঘরে–বাইরে* (১৯১৬), *গণদেবতা* (১৯৪২) প্রভৃতি উপন্যাসে জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটিই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু *দর্পণ*–এ যে-শোষকেরবিরুদ্ধে জনতার সংগ্রামের কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে, সে-শোষকঔপনিবেশিকচরিত্রের নয়— বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রই তার আসল পরিচয়। লোকনাথ-উমাপদ-হেরম্ব এরা তৎকালীন ভারতবর্ষেরই কারখানামালিক বুর্জোয়া-ঠিকাদার। অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণেন্দু-বীরেশ্বর-ওসমানেরা-যে লড়াই করে তারাও ওই ভারতবর্ষেরই নিপীড়িত নিগৃহীত অত্যাচারিত শোষিতশ্রেণীর মানুষ। সংগ্রামের এই নতুন রূপ, নতুন চেতনা সঞ্চার করে বাংলা সাহিত্যে মানিক নবযুগের সূচনা ঘটালেন।

মানিকের শিল্পিজীবনেও এ–উপন্যাস একটি যুগসন্ধির সাক্ষ্য বহন করছে। লেখকজীবনের শুরুতে মানিকের শিল্পিসত্তায় সমাজবাস্তবতার চেয়ে মনোবাস্তবতার গুরুত্বই ছিল অধিক। *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫), *পদ্মা নদীর মাঝি* (১৯৩৬), *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) কিংবা *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬) প্রভৃতি উপন্যাস তারই নিদর্শন। *দর্পণ* -এ মানিক জীবনের বহির্বাস্তবতার দিকেই তাঁর শিল্পদৃষ্টির আলো ফেলেছেন অধিকমাত্রায়। তবে জীবনের অন্তর্বাস্তবতাকে এ উপন্যাসে তিনি অস্বীকার করেন নি। *দর্পণ* উপন্যাসের যে-সাফল্য তা এ-দুয়ের সার্থক সমন্বয়সাধনের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকেই মানিক বহির্বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ও অন্তর্সংকটের নানা টানাপোড়েনসমেত উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। বহির্জীবনের পাশাপাশি অন্তর্জীবনেরক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসমূহকেও তিনি সমান মর্যাদার সঙ্গে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। শিল্পী হিসেবে এক্ষেত্রে মানিকের নিরাসক্তি ও সহানুভূতি উভয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। কেননা মানুষের এই-যে দুই প্রস্থের জীবন— তা কেবল শিক্ষিতের ক্ষেত্রে নয়, অশিক্ষিত এমনকি একেবারে সাধারণ চরিত্রের ব্যাপারেও সমানভাবে প্রযোজ্য—সেকথা মানিক অস্বীকার করতে চান নি। অন্তর্সংকটের যন্ত্রণা তাই হীরেন-মমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যাপ্ত হয়েছে বীরেশ্বর-রম্ভা পর্যন্ত। বীরেশ্বরের যে-আত্মদংশন বা আত্মআবিষ্কার[৪২] কিংবা রামপাল সম্পর্কে রম্ভার যে নবমূল্যায়ন বা চিত্তজ্বালা[৪৩]— সবকিছুর পেছনেই মানিকের এই দ্বিমাত্রিক জীবনোপলব্ধি সক্রিয় থেকেছে। মানিকের অন্তর্জীবন অন্বেষার এই স্বাতন্ত্র্যের ফলেই দুর্গা (*গণদেবতা*) থেকে রম্ভার পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এই

পার্থক্য কেবল চরিত্রশুদ্ধতার মাপকাঠিতেই বিচার্য নয়। দুর্গার অন্তর্ময় জীবনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপকে তারাশঙ্করের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় নি; কিন্তু মানিক এক্ষেত্রে পুরোপুরি আলাদা। তিনি রম্ভা চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন তার বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন সংকটের যোগসাজশে। সূর্যবাবু ও রামপাল উভয় চরিত্রের সংস্পর্শে আসার মুহূর্তগুলোতে রম্ভার এরূপ দ্বিমাত্রিক উন্মোচনই আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাছাড়া মনোবাস্তবতা চিত্রায়ণে যৌনপ্রসঙ্গও বাদ পড়ে নি। শোষকচরিত্র উমাপদ, মাতাল হীরেন ও রামপাল, বালক নরেশ প্রভৃতি চরিত্রের যৌনতাড়না প্রবল রাজনৈতিক সংগ্রামবাস্তবতার মধ্যেও সক্রিয় থেকেছে। এদিকে লক্ষ রেখে কারো কারো দৃষ্টিতে *দর্পণ* উপন্যাসকে মানিকের ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় জীবনাদর্শ-প্রেরণার এক চমৎকার সম্মিলনসাধন বলে মনে হওয়াও বিচিত্র নয়।

মানিকের রাজনীতিভাবনার আরেকটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য এ-উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম ও সম্প্রদায়ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর মন ছিল আগাগোড়া সর্বপ্রকার সংস্কার ও গোড়ামিমুক্ত। মিশনারি কলেজে অধ্যয়নকালে একজন পাদ্রীর নিকট তিনি বাইবেল অধ্যয়ন করেন। এছাড়া তাঁর পিতার কল্যাণে পারিবারিক পরিবেশও ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবগঠনের অনুকূল। মানিকের অধ্যয়নসীমায় যে-গ্রন্থতালিকা পাওয়া যায়, তাও তাঁর সম্প্রদায়নিরপেক্ষ মানসিকতা গঠনে সহায়ক হয়েছে। এ-উপন্যাসে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে চারটি প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে : মুসলিমবন্ধু আরিফ প্রসঙ্গে মমতার মনোভাব, লোকনাথের কারখানা থেকে মুসলিম শ্রমিকদের ছাঁটাই, ঝুমুরিয়াবাসীর মনের ধর্মীয় অনুভূতি এবং ঝুমুরিয়াবাসীর প্রতিরোধসংগ্রামে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ ভাবতরঙ্গ ইত্যাদি। আরিফ মমতার বন্ধু এবং এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে, অন্যের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আরিফের গ্রেপ্তারের সংবাদে হঠাৎ-আবেগতাড়িত মমতা তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে ফেলে। এমনকি মমতার স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, আরিফ সম্পর্কে দু-চারবার এমন জোরালো 'সেক্স্ আর্জ' সে অনুভব করেছে যে, যোগাযোগ হলে ওই সময় হয়ত কিছু ঘটেও যেতে পারত। এবং তেমন কিছু ঘটলেও মমতার মনে আফসোস কিংবা পাপবোধের উদয় হতো না। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি, মমতা আরিফের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে মুসলমান হতে চাইছে। আরিফ ও মমতার বন্ধুত্বে ধর্মীয় অনুভূতি কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে নি, দুজন-যে দুই সম্প্রদায়ের অন্তত মনের দিক থেকে কেউ তা কখনও ভাবে নি। মমতার মুসলমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষার পেছনে সামাজিক চিন্তাই ক্রিয়াশীল। তবে এরূপ ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচন করেই

মানিক সন্তুষ্ট থাকেন নি, এর সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিও তিনি সমান মনোযোগী। লোকনাথের রঙের কারখানা থেকে মুসলিম শ্রমিকদের ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে হীরেনসহ কৃষ্ণেন্দুর ওসমান আলীর গৃহে গমন এবং সেখানে তাদের আলোচনা, আচরণ ও আপ্যায়নে ধর্মবিদ্বেষ অন্তর্হিত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মানিসকতাই প্রাধান্য অর্জন করে। অতঃপর শুধু সামাজিক প্রতিক্রিয়াও নয়, মানিক অগ্রসর হয়েছেন রাজনীতিতে এর প্রভাব–প্রতিক্রিয়া দেখাতেও। অত্যাচারী ঠিকাদার হেরম্ব চক্রবর্তী সম্পর্কে ঝুমুরিয়াবাসীর মনে যে-ভয়, তার পেছনে ধর্মীয় কুসংস্কারও বিশেষভাবে সক্রিয়। এ-বিষয়ে কৃষ্ণেন্দুকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে হীরেন বলে :

> ... ধর্ম আর সংস্কার যে এদেশের মন কিভাবে গ্রাস করে আছে খেয়াল থাকলে কেন ওকে সকলে এত ভয় আর খাতির করে তুইও সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারতিস। এদেশে ধর্ম ছাড়া কথা নেই। চারিদিকে তার প্রমাণ তো দেখতেই পাস সর্বদা। ধর্মের দোহাই ছাড়া এদেশে রাজনীতি হয় না, আন্দোলন চলে না। এদেশে নেতাকে হতে হয় মহাত্মা। আধ্যাত্মিকতার স্তরে টেনে তুলতে না পারলে এদেশে কিছুই করার উপায় নেই। এটা তোরা ভুলে থাকিস। ধর্ম আর সংস্কারের কথা শুনলে অবশ্য তোরা বাস্তবপন্থীরা অসন্তুষ্ট হোস, কিন্তু যা আছে তা আছে।[৪৪]

কৃষ্ণেন্দুদের রাজনৈতিক আদর্শ–পরিসীমায় কুসংস্কার ও গোঁড়ামির কোনো স্থান না থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তা আছে— এই উভয় দিক হীরেনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। কিন্তু মানিক ঔপন্যাসিক হিসেবে বাস্তবতার এই চিত্র এঁকেই দায়িত্ব শেষ করেন নি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, সংগ্রামবিমুখ সাধারণ অবস্থায় মানুষের মধ্যে এসব ধর্ম-সংস্কারভীতি সক্রিয় থাকলেও শোষণ-অত্যাচারবিরোধী আন্দোলনে যখন তারা জোটবদ্ধ হয় তখন পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত ও নির্ভীক হয়ে ওঠে।— এটা দেখানো ছিল মানিকের মূল উদ্দেশ্য। উপন্যাসের শেষে আমরা লক্ষ করি, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলে অগ্রসর হয়েছে হেরম্বের নিধনযজ্ঞে :

> আবদুল হাই বলে, 'না কাদের, হিঁদু মোছলমানের বাত এতে উঠবে না। ঢের মোছলমান মার খেয়েছে। জালালুদ্দীন মিঞার ব্যাপারে মোরা চুপচাপ রইলাম, তাতে একটু বিগড়ে আছে সবাই। এবার জবরদস্তি চলবে না, কারণ ভি করা হবে না। যার খুশী যাক।'
>
> হাফিজ আলি সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক বাত। হাঙ্গামা হবে তো উপায় কি!'[৪৫]

নিপীড়ক-শোষক যত চতুর বিত্তশালী ও ক্ষমতাবানই হোক, বঞ্চিত-অবহেলিতদের সংঘবদ্ধ সক্রিয়তায় তার বিনাশ অনিবার্য— রাজনীতির এ-

বিজ্ঞানধর্মই *দর্পণ* উপন্যাসে বাস্তবরূপ লাভ করেছে। এ-উপন্যাসে মানিক স্পষ্টতই বলতে চেয়েছেন, শ্রমজীবী শোষিত গরিবেরা ততকালই দুর্বল ভীরু এবং অগ্রসরগতিতে অনাগ্রহী যতকাল তারা অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল। কৃষ্ণেন্দু-চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানিক এ উপন্যাসে এমন-এক নায়ককে সৃষ্টি করলেন, যে শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের আদর্শনেতার গৌরব অর্জন করেছে। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ইতিহাসে যে-কয়জন আদর্শনেতার চরিত্র (*আনন্দমঠ, গোরা, ঘরে-বাইরে, চার অধ্যায়, পথের দাবী, একদা, ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা* প্রভৃতি উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রের কথা স্মরণীয়) মানিকের সামনে ছিল, তাদের থেকে কৃষ্ণেন্দু একেবারে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র কেবল অবয়বে নয়, রক্ত-মাংস-মেজাজ-আচরণ সবদিক থেকে। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম এমন একটি নেতৃচরিত্র আমরা পেলাম যাকে বাস্তব-অতিরেক গুণাবলি দ্বারা অসাধারণ করে তোলা হলো না : "ধীর স্থির শান্ত মানুষ সে, কত অভিজ্ঞতায় গড়া আবেগহীন বাস্তববোধ ··· "।[৪৬] কেবল কৃষ্ণেন্দু-চরিত্রেই নয়, এই নিরাবেগ বাস্তবতা সমগ্র উপন্যাসশরীরে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে *দর্পণ* স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে।

উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র হীরেন ও মমতার মধ্য দিয়ে এ-সত্যই প্রতিষ্ঠালাভ করেছে যে, উচ্চবিত্ত ও শোষক পরিবারে লালিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আদর্শস্পৃহা যত প্রবলই হোক শ্রেণীচরিত্র বিসর্জন তাদের জন্য কেবল কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভবও। শ্রমিকশ্রেণীর জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের সংগঠিত ও তাদের জীবন সুখময় করে তোলার সকল প্রয়াসই মমতার জীবনে ব্যর্থ হয়ে যায়। এমনকি বন্ধু, ও পরে স্বামী, হীরেনকে নিজ আদর্শের পুরোপুরি সঙ্গী করার প্রকল্পও তাঁর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উপন্যাসের শেষে মমতা গৃহিণী ছাড়া তার অন্যসব পরিচয় হারিয়ে ফেলে। মমতা-চরিত্রের এ ব্যর্থতা তার পারিবারিক পরিচয়ের দিকেই আমাদের অঙ্গুলিনির্দেশ করে। নিজ শ্রেণীপরিচয়ের সীমাবদ্ধতাই তার সকল অসফলতার উৎস। আসলে বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক পিতার একমাত্র কন্যা হিসেবে অতিস্নেহে লালিত-পালিত মমতার ভাববিলাসময় জীবনের সকল আদর্শগত প্রতিশ্রুতিই তার উচ্চবিত্ত জীবনপাঁকে বারবার তলিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত আমরা *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসের 'মনোজিনী'র সঙ্গে 'মমতা'-চরিত্রের তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে শেষোক্ত চরিত্র নির্মাণে মানিকের সাফল্য অনুসন্ধান করতে পারি। মনোজিনী-চরিত্রে মানিক আদর্শবাদিতার যে প্রলেপ পরিয়েছেন তা ভেদ করে বাস্তব রক্তমাংসের নারীকে আবিষ্কার করা পাঠকদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মমতা-চরিত্রে আদর্শপরায়ণতার সঙ্গে বাস্তববোধের সংমিশ্রণ

ঘটেছে সার্থকভাবে। মধ্যবিত্তের ভাবালুতা, আইডিয়ার ভাবাবেগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মমতা কখনও কখনও মনোজিনীরই স্বগোত্রীয় হিসেবে চিহ্নিত হলেও ওই ভাবালুতাকে অতিক্রম করে রক্তমাংসের আবেগে রক্তিম মমতাকে চিনতেও আমাদের কষ্ট হয় না। ভবিষ্যৎ-স্বামী ও বন্ধু হীরেন যখন তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে পিতার সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয় কিংবা বন্ধু আরিফ যখন তাকে গ্রেপ্তারের সংবাদ দেয়— তখন উভয় ক্ষেত্রেই হঠাৎ আবেগদীপ্ত মমতা উভয়কে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে। শুধু তাই নয়, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলনপ্রচেষ্টাজনিত জীবনদ্বন্দ্বে মমতা প্রতিনিয়ত যেরূপ ক্ষতবিক্ষত হয়, মনোজিনীর মধ্যে তার কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। মনোজিনী দ্বন্দ্ব-উর্ধ্ব একটি মীমাংসিত চরিত্র, কিন্তু মমতা তা নয়। মমতা-চরিত্র নির্মাণে এখানেই মানিকের সাফল্য।

অন্যদিকে কারখানামালিকের একমাত্র পুত্র হীরেন বন্ধু ও স্ত্রী সাহচর্যে যখনই পরিশ্রমজীবীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে চেয়েছে তখনই শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বাধার সম্মুখীন হয়েছে সে। ফলে আদর্শ-অনুপ্রেরণার কোনো প্রয়াসই তার সফল হতে পারে নি। ঝুমুরিয়ার কৃষক বীরেশ্বর-হত্যার প্রতিশোধগ্রহণে সংকল্পবদ্ধ কৃষ্ণেন্দুর সহযাত্রী হয়েছে সে স্বেচ্ছায়, অথচ ঝুমুরিয়ায় পৌঁছে একপ্রহরের বেশি কৃষ্ণেন্দুর সহকর্মী থাকতে পারে নি। পুলিস যে-রাতে কৃষ্ণেন্দুকে গ্রেপ্তার করে, সেই রাতেই মাদকের নেশা চরিতার্থ করার জন্য শত্রুশিবিরে যেতে তার এতটুকু বিবেকদংশন হয় নি, এমনকি ওই রাতেই অ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়ায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতেও তার বাধে নি। উভয় ক্ষেত্রে শ্রেণীমানসতাই তার মুখ্য হয়ে উঠেছে। ঝুমুরিয়ার শান্তিপ্রিয় কৃষককুল যখন ফুঁসে উঠেছে প্রতিশোধগ্রহণের সংকল্পে, কলকাতা থেকে অতদূর গিয়েও অন্যায়ের প্রতিকারে অংশগ্রহণ না-করে হীরেন তখন পলায়নপর মানসিকতার বশবর্তী হয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের পার্থক্য এখানেই। এই ব্যবধানকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মানিকের শিল্পিহস্ত বিশেষভাবে নির্মম ও লক্ষ্যভেদী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মানবজাতির চেতন ও অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দ্বন্দ্ব–সংঘাত, সংঘর্ষ-সমন্বয় প্রভৃতির সূক্ষ্ম ও জটিল অন্তর্বয়নে শিল্পী হিসেবে মানিক ছিলেন নিবিষ্ট ও আন্তরিক। বিশেষত অবচেতন মনের বিচিত্র, জটিল ও গোপন যেসব স্বপ্ন ও কামনা দ্বারা মানুষ অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, তা উন্মোচনেই মানিকের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা ছিল সমধিক। ফলে তিনি তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসেও চরিত্রসমূহের অবচেতন মনের চিন্তা-পরিকল্পনার সূত্র বিশ্লেষণে সমান

মনোযোগী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন যে, অত্যধিক মাদকসেবনের ফলে মানবমনের সচেতনাংশ অনেকটা নিষ্ক্রিয় ও শিথিল হয়ে পড়ে এবং অবচেতন অংশই তখন সজীব ও সক্রিয় হয়। যে-সংযম মনুষ্যচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, তা তার সচেতন মনেরই অবদান। কিন্তু মাদকসেবন মানুষের সচেতন মনের সংযমস্পৃহাকে অবলুপ্ত করে দিলে অবচেতন মনের অস্বাভাবিক অসংযত গোপন অভিলাষই অনিবার্যভাবে পত্রপল্লবিত হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে রামপাল কর্তৃক মমতাকে বাহুবেষ্টনে আকর্ষণ কিংবা হীরেন কর্তৃক দিগম্বরীর ওপর ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার আপাত-অস্বাভাবিক আচরণ দুটি অত্যধিক মদ্যপানের ফলেই সম্ভবপর হয়।

বীরেশ্বর-চরিত্র অঙ্কনের শিল্পরেখাসূত্রেও মানিক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য স্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন। বদমেজাজ আর জিদের জন্য বীরেশ্বরের খ্যাতির কথা যেমন মানিক উল্লেখ করেছেন, তেমনি তাকে 'স্বাধীনচেতা এবং চাষীর পক্ষে আশ্চর্য্যরকম সংস্কারমুক্ত খাপছাড়া লোক' হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। এ-ধরনের লোক রাজনৈতিক প্রতিবাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযুক্ত বিবেচিত হলেও প্রতিকারের পথে-যে নিতান্ত বেমানান, তা বিশ্লেষণেও মানিকের শিল্পিমন অতিশয় সতর্ক। বীরেশ্বর সম্পর্কে নায়ক কৃষ্ণেন্দুর মূল্যায়ন : "আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদী লোক দিয়েও কাজ চলে কিন্তু তীব্র অভিমানের তাপে এত বেশী মাথা গরম হলে বিপদ হয়।"[৪৭] জন্ম-প্রতিবাদী এরূপ চরিত্র আমাদের বাস্তবজীবনে অত্যন্ত সহজলভ্য। কোনো ধরনের অন্যায়-অবিচারের মুখোমুখি হলেই এরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে— সেই প্রতিবাদের বৈশিষ্ট্য এমনই অন্তর্গত ও সহজাত-যে স্থানকালপাত্র ভেদাভেদ মানে না। তাই জীবনব্যাপী প্রতিবাদী এই বীরেশ্বরকে সকলে ভয় করে। তবে তার প্রতিবাদ কারো জন্য-যে কল্যাণ বয়ে আনে না, এ ব্যাপারেও সে একসময় সচেতন হয়। আত্মআবিষ্কারের যন্ত্রণায় সে পুড়তে থাকে:

> মনটা নুয়ে বাঁকা হয়ে যায় বীরেশ্বরের। জীবনে আর কখনো সে এমন জগদ্দল পাষাণের মত ভারি জমাট বাঁধা বিষাদ অনুভব করে নি। আজ তার প্রথম মনে হয় মানুষটা সে সুস্থ স্বাভাবিক নয়, সে সত্যই খ্যাপা, পাগলাটে, খাপছাড়া। লোকে যে বলে তাই ঠিক, মাথায় তার পোকা আছে। এতদিন কার সঙ্গে সে লড়াই করে এল, কিসের সঙ্গে? ভগবান জানেন, লড়াই সে করেছে অবিরাম। বাইরে বড় সংঘর্ষের সুযোগ তার বেশী জোটে নি, দৈনন্দিন জীবনের অনেক অনিয়ম, অনাচার, অবিচার অন্যায়ও সে সয়ে গেছে নিরুপায় ধৈর্যের সঙ্গে, কিন্তু মন তার মহত্তর অসঙ্গতিকেও মেনে নেয় নি, উদ্যত উদ্ধত প্রতিবাদ গুমরে গুমরে গর্জন করেছে। সব তার মাথার বিকারের লক্ষণ— চড়া বায়ুর প্রমাণ। কি এসে গেছে তার প্রতিবাদে? যা ঘটবার সবই ঘটেছে, কেউ ঠেকাতে পারে নি।[৪৮]

এরূপ লক্ষ্যহীন প্রতিবাদে তার নিজের ও অন্যের কোনো কল্যাণ না–ঘটার যন্ত্রণায় সে দগ্ধ হলেও উপন্যাসের শেষে এ-ধরনের প্রতিবাদেরও একটি সফল পরিণতি-চিত্র মানিক অঙ্কন করেছেন। অবশ্য বীরেশ্বর তার আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারে নি। নিজ জীবনকে উৎসর্গ করেই সে গ্রামবাসীর কল্যাণ বয়ে এনেছে। শিল্পী হিসেবে মানিকের মহত্ত্ব এখানেই যে, বীরেশ্বর-চরিত্রের নেতবিাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ উন্মোচন করেই তিনি কর্তব্যমুক্ত হন নি। এ-ধরনের প্রতিবাদপুষ্ট চরিত্র সম্পর্কে শোষক-পীড়কদের মনে তীব্র আতঙ্ক থাকার ফলে এদের বিনাশেই যে তারা অধিক তৎপর হয়; অন্যদিকে সমগোত্রীয়রা সাধারণত এদের এড়িয়ে চললেও এদের আন্তরিকতা ও সততার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ায় এদের হত্যার ঘটনা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে-যে ব্যাপক ক্ষোভ ও জ্বালা-সে-সত্য উন্মোচনেও মানিক সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। বীরেশ্বরের হত্যা-পরবর্তী ঝুমুরিয়াবাসীর প্রতিরোধক্ষীত জাগরণের মধ্যে উপর্যুক্ত রাজনৈতিক সত্যই বাঙ্ময় হয়েউঠেছে।

এ উপন্যাসে মানিকের স্বচ্ছ ও পরিপক্ব রাজনীতি-চিন্তার আরও একাধিক উদাহরণ রয়েছে। *সহরতলী* উপন্যাসের সত্যপ্রিয় ও *দর্পণে*র লোকনাথ-চরিত্রকে পাশাপাশি স্থাপন করলে এর সত্যতা অনুধাবন করা সম্ভব। সত্যপ্রিয় ও লোকনাথ উভয়ে "ধীর, স্থির, শান্ত, গম্ভীর, উদার, মহৎ, আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষ, কুটিল, সাবধানী ও হিংস্র" প্রকৃতির। কিন্তু সত্যপ্রিয় শ্রমিকবিদ্রোহ দমনে যত সফল, লোকনাথ তত নয়। শ্রমিকদের সংগঠিত সচেতনতা এবং তাদের যোগ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিই এর কারণ। শ্রমিক-প্রতিনিধি হিসেবে যশোদার শ্রমিকস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সচেতনতা ও কৌশলপরায়ণতার অভাবে, অথচ *দর্পণে* কৃষ্ণেন্দুর মতো বিচক্ষণ সাবধানী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা থাকার কারণে ওই জাতীয় প্রচেষ্টা অসফল হতে পারে না। সত্যপ্রিয়ের মেয়ে-জামাই সংক্রান্ত সংকটের সঙ্গেও লোকনাথের পুত্র ও পুত্রবধূ অর্থাৎ হীরেন-মমতা-জনিত সমস্যার তুলনা করা যেতে পারে। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে তার মেয়ে-জামাইয়ের যে-দ্বন্দ্ব তা রাজনীতিসংক্রান্ত নয়, অনেকটা অন্যায় শাসন ও তজ্জাত অভিমানপ্রসূত। কিন্তু লোকনাথের সঙ্গে হীরেন-মমতার বিরোধ প্রকৃতই রাজনীতি ও আদর্শের। এবং এই সংঘাতে লোকনাথ পুরোপুরি জয়ী হতে পারে না। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের নিকট তার মেয়ে-জামাই পুরোপুরি হেরে যায়। সত্যপ্রিয় মেয়ে-জামাইয়ের ব্যাপারে যত নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে, লোকনাথ হীরেন-মমতার ক্ষেত্রে তত নির্দয় হতে পারে না। প্রবল ক্রোধকেও তার অবদমন করতে হয় হীরেন-মমতার

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতি-সচেতনতার কারণে। সত্যপ্রিয়ের মেয়ে-জামাই যশোদার গৃহে আশ্রয় নিয়েই তাদের প্রতিবাদকে সীমাবদ্ধ রেখেছে, এর বেশি কিছু করার সাহসও তাদের ছিল না। অন্যদিকে লোকনাথের পুত্র ও পুত্রবধূ স্বতন্ত্র গৃহ ভাড়া নিয়ে বসবাসই শুধু করে নি— হীরেন অংশগ্রহণ করেছে তার পিতার কারখানার বিদ্রোহী শ্রমিকদের সভায় এবং মমতা শ্রমিকবস্তিতে আশ্রয় নিয়ে স্বামী ও শ্বশুরের সামাজিক অবস্থানকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছে। সংগঠিত ও সচেতন প্রতিবাদের কাছেই শোষকদের প্রকৃত পরাজয় — এ সত্যটিই অধিকতর বাস্তবতালাভ করেছে *দর্পণ* উপন্যাসে। *সহরতলী*র সত্যপ্রিয়ের পর এ-উপন্যাসে এমন দুটি বুর্জোয়া শোষকচরিত্র অঙ্কন করা হয়েছে যাদের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য বিচার করলেও মানিকের স্বচ্ছ রাজনীতি-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এর একজন লোকনাথ— সত্যপ্রিয়ের মতো যিনি শিল্পপতি, অন্যজন হেরম্ব চক্রবর্তী— যিনি ঠিকাদার-ব্যবসায়ী, শহরের যন্ত্রসভ্যতার পরিবর্তে গ্রামের সামন্তজীবন ঘেঁষেই অতিদ্রুত যার পুঁজিবৃদ্ধি ঘটছে। লোকনাথ কারখানাপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকশোষণ যেমন করে, তেমনি বীমা ব্যবসায়ের অংশীদারকেও সমানভাবে ঠকায়। শ্রমিকের বিদ্রোহদমনে লোকনাথ নির্মম ও কৌশলী। মুনাফাব্রত জীবনে একজন শোষক-বুর্জোয়ার যেসব বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য, তার কোনোটি থেকে লোকনাথ কিংবা হেরম্ব মুক্ত নয়। তদুপরি এ দুটি চরিত্রের কিছু কিছু ভিন্নতাকেও মানিক স্পষ্ট করার প্রয়াসপেয়েছেন— ফলে উভয় চরিত্র বাস্তবতার স্পর্শে হয়েছে স্পষ্ট ও বাঙ্ময়। হেরম্ব ও লোকনাথ-চরিত্রের এ-পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে শত্রুদমনের কৌশলপ্রক্রিয়ায়। সন্দেহ নেই, একমাত্র মুনাফালাভই শোষকশক্তির জীবনব্রত। সেই মুনাফাঅর্জনের পথে অন্তরায় এমন যেকোনো শক্তিই তার কাছে শত্রুতুল্য। অতএব বাধাদানকারী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে মুনাফালোভী শোষক সর্বদাই সংকল্পদৃঢ় ও নির্মম। তবু এক্ষেত্রে একজন কারখানামালিক ও একজন ব্যবসায়ী-বুর্জোয়ার পার্থক্যও কম নয়। নীতিগত দিক থেকে না-হলেওপ্রয়োগগত কৌশলেই এই ভিন্নতা অধিকতর স্পষ্ট। বনের কাঠকাটা কিংবা কৃষকের জমির ওপর দিয়ে রাস্তানির্মাণের কাজে মজুরসংগ্রহের ব্যাপারে হেরম্বের আচরণ যত নীচ, ভয়ঙ্করস্বভাবের, অসংযত ও পাশবিক— লোকনাথের তা নয়। শ্রমিকবিদ্রোহ দমনে লোকনাথ তুলনামূলকভাবে অনেক কৌশলী ও সংযমী। যন্ত্রসভ্যতার স্পর্শে একজন শিল্পপতি যে-সংযমকৌশল আয়ত্ত করে, একজন কম্প্রাডর-বুর্জোয়া তা থেকে বঞ্চিত—এই পার্থক্যরেখাটি অঙ্কনেও মানিকের নিগূঢ় রাজনীতিসচেতন-তারই পরিচয় মেলে।

৪

একেবারেই সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত *চিহ্ন* উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাসকে প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ বলা যায়। আদি, মধ্য ও অন্তে বিভক্ত কোনো একটি বা দুটি মানুষ বা পরিবারের কাহিনী এ-উপন্যাসে গতিশীল হয়ে কোনো প্লট নির্মাণ করে নি। কিংবা নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্বনায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে ঘটনাবলি আবর্তিত ও পত্রপল্লবিত হয়েও সুনির্দিষ্ট পরিণতি অর্জন করে নি এ-উপন্যাসে। *চিহ্ন* উপন্যাসের নায়ক প্রকৃত অর্থে রাজপথ। সেই রাজপথের রাজনৈতিক সংগ্রামই এর প্লট রচনা করেছে। একটি চলমান ক্যামেরা যেন ওই সংগ্রামের নানা টুকরো চিত্র ধারণ করে উপন্যাসের কাহিনীকে সম্পূর্ণতাদান করেছে।

চিত্রগুলো নিম্নরূপ:

ক. একুশ/ বাইশ বছরের যুবক গণেশ। গ্রামের ছেলে। কলকাতায় 'বিদ্যুৎ লিমিটেড' নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক দাশগুপ্ত চোরাকারবারের সঙ্গেও যুক্ত। চোরাবাজারের 'বিদেশী মদ' ক্যামারন নামের জনৈক বিদেশীর নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশ্বস্ত কর্মচারী গণেশকে দায়িত্ব দিয়েছিল দাশগুপ্ত। কিন্তু দায়িত্ব শেষ করার পূর্বে পথিমধ্যেই সে গুলিবিদ্ধ হয়। ছাত্রদের অবস্থান-ধর্মঘট ও তা ভাঙার জন্য পুলিসি মহড়া দেখে গণেশ থমকে দাঁড়িয়েছিল। কর্তব্যকর্ম ভুলে গিয়েছিল সে। পুলিসের গুলি তার প্রাণস্পন্দনকে স্তব্ধ করে দেয়। অবস্থানরত বিশাল জনসমাবেশ কি আর এগোবে না?—এই ছিল তার মৃত্যুপূর্ব সর্বশেষ প্রশ্ন। গণেশের মৃত্যুকালীন এই প্রশ্ন দিয়ে উপন্যাসের শুরু। উপন্যাসের সমাপ্তিতে ওই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়। প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ মিছিল পুলিসি অন্তরায় অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খ. গুলিবিদ্ধ গণেশকে হাসপাতালে নিয়ে যায় কারখানাশ্রমিক বৃদ্ধ ওসমান। ওসমানের পুত্র হাবিব নিহত হয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনে। গণেশের মৃতদেহ যখন হাসপাতালের মর্গে পচন-উন্মুখ, তখন তার বাবামা ভাইবোন ঘটনাচক্রে কলকাতায় গিয়ে উপস্থিত হয়। গণেশের বোন রানী শাসকশক্তির প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যভিচারের শিকার হলে গ্রামবাসী সম্মিলিত শক্তিপ্রয়োগে তাকে উদ্ধার করে এবং পরিবারসমেত তাদের পালানোর ব্যবস্থা করে। অনন্যোপায় যাদব-পরিবার গণেশের উদ্দেশে কলকাতামুখী হয়। কিন্তু কলকাতায় পৌঁছে তারা পুত্রের সাক্ষাৎ কিংবা সঠিক তথ্য কিছুই পায় না। বরং রাজনৈতিক অভিঘাতে কম্পমান এক

অচেনা কলকাতাকে প্রত্যক্ষ করে এবং অনিশ্চয়তার বিশাল শূন্যতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

গ. হেমন্ত মেধাবী কলেজছাত্র, পিতৃহারা। মাতৃআয়ে তাদের দুই ভাই ও একবোনসমেত সমগ্র পরিবারের জীবিকানির্বাহ হয়। হেমন্ত দ্রুত পাঠ শেষ করে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করুক—মায়ের এই একান্ত ইচ্ছার সঙ্গে হেমন্তেরও কোনো মতবিরোধ নেই। তবে হেমন্তের এরূপ পরিবারস্বার্থে কেন্দ্রীভূত সত্তার ঘোরতর বিরোধী তার সতীর্থ, রাজনীতিতে সক্রিয় সীতা। কম্পমান কলকাতার রাজপথ হেমন্তকে মাতৃ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহায্য করে। সভা ও মিছিলে যোগদান শেষে গুলিবিদ্ধ হেমন্ত আহতাবস্থায় হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরে। তার অনুজ জয়ন্ত, বয়স যার তের বছর, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়।

ঘ. কিশোর রজত অনেকের সঙ্গে বসে থাকে রাজপথে। তার বোন শান্তি রাজনৈতিক কর্মী। অবস্থান-ধর্মঘটকারীদের মধ্যে সেও আছে। ওই সমাবেশে রজতের আসার কথা নয়, তাকে কেউ আসতেও বলে নি। কিন্তু তার নির্ভীক ও কৌতূহলী কিশোরসত্তা একাত্ম হয়ে পড়েছে সহস্র মানুষের সংগ্রামে।

ঙ. রসুলও কলেজছাত্র। মন্বন্তরের সময় গ্রামে দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে চোরাকারবারি জমিদার কর্তৃক অত্যাচারিত। অবস্থান-ধর্মঘটীদের ওপর পুলিস গুলিবর্ষণ করলে রসুল আহত হয়। ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েও রসুল বসে থাকে, ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ তাকে দুর্বল করে দেয়। শিবনাথ তাকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। আহত অবস্থায়ই হাসপাতালে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে। আবেগায়িত রসুল মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য গভীররাতে পুলিসের চোখ এড়িয়ে দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়েও দীর্ঘ পথ হাঁটে।

চ. ব্যাঙ্কের চাকুরে অক্ষয়। নিয়মিত মদপানে অভ্যস্ত। ওইদিন রাজপথে ছাত্র-যুবকদের মরণপণ সংগ্রামের নেশা প্রত্যক্ষ করে অক্ষয় নিজের মদের নেশার কথা ভুলে যায়। অবস্থানকারীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় সে।

ছ. চল্লিশ টাকা মাইনের কেরানি অজয়। তার পরিচয় দিতে গিয়ে মানিক বলেছেন : "সে এখন চাকুরে, কেরানী! মাস-কাবারী চল্লিশ টাকা বেতনটাই এখন তার আশা আনন্দ ভবিষ্যৎ— হাওড়ার ওই বস্তি-ঘেঁষা নোংরা পুরানো ভদ্রপল্লীর ওই টিনের চাল মাটির দেয়াল আর লাল সিমেন্টের মেঝেওয়ালা বাড়িটার অংশটুকুতেই আটকে গেছে জীবন তার চিরদিনের জন্য ...."।[৪৯] যুদ্ধশেষের সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার চাকরিও শেষ হওয়ায় কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই অজয়কে চাকরি নিতে হয়েছে। পুরো সংসার এখন তার ওপর নির্ভরশীল।

তার বিবাহযোগ্য বোন মাধুর পরনে এমন ছেঁড়া শাড়ি, যা দিয়ে লজ্জানিবারণ হয় না। রাঁধুনির কাজ নিয়ে জীবিকানির্বাহের পরিকল্পনা করে সে। এমন অভাবগ্রস্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম অজয়ও পারিবারিক কর্তব্যবোধ অতিক্রম করে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মানসিকভাবে একাত্ম হয়ে পড়ে। চাকরিচ্যুত হওয়ার ভয়ে ভীত হয় না; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তাকে সাহসী করে তোলে।

জ. জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে খ্যাতিমান বসন্ত রায়ের সহকারী হিসেবে পরিচিত অমৃত মজুমদার। বসন্ত রায়ের খ্যাতি তাকে ঈর্ষান্বিত করে। কিন্তু যোগ্যতার অভাব তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে বাধা। রাজপথের রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রতি জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন নেই, কিন্তু নেতৃত্বের তীব্র স্পৃহা অমৃত মজুমদারকে বারবার আন্দোলনকারীদের কাছে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তার স্ত্রী অরুণা মজুমদারেরও রয়েছে অভিলাষী প্রেরণা। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে অযোগ্য অমৃত মজুমদার যখন ব্যর্থ হতে চলে, তখন তার আঘাত সহ্য করতে না-পেরে নিহত হয় হৃদরোগ-আক্রান্ত অরুণা মজুমদার।

এমন টুকরো টুকরো নানা গতিশীল চিত্রের মোটাদাগের অঙ্কনেই *চিহ্ন* উপন্যাস সমগ্রতা অর্জন করেছে। সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছে রাজপথে ছাত্র-তরুণদের এক বিশাল শোভাযাত্রার, পুলিস কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, অবস্থান ধর্মঘট। পুলিসের লাঠিচার্জ, গুলি, পিষে মারার হুমকি ইত্যাদি সবকিছু উপেক্ষা করে ধর্মঘটীরা রাতব্যাপী নিশ্চলভাবে রাজপথে অবস্থান করলে তাদের যে-দৃঢ়তা সাহস ও একনিষ্ঠার প্রকাশ ঘটে তাতে কলকাতার সর্বস্তরের জনগণ এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। বিভিন্ন শ্রেণী-স্তরের মানুষের মনের গহনে এই সংগ্রামপ্রক্রিয়ার অভিঘাত যে-বিচিত্রভাবে অনুভূত হয়, তারই ভাষাচিত্র হয়ে উঠেছে এ-উপন্যাস। একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিমনের যে-পরিবর্তনসাধন, তার মর্মগাথা উপস্থাপনই এ-উপন্যাসেরসবচেয়ে উজ্জ্বল দিক।

পিতৃহারা যে-হেমন্ত মুহূর্তকালের জন্যেও পরিবারের প্রতি কর্তব্যচিন্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, মাতৃআজ্ঞাকে শিরোধার্য করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলে, বন্ধুমহলে 'ভালো ছেলে' বলে উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠে, সেই হেমন্তও ওইদিন জনসভা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরদিনও, মায়ের অসম্মতি সত্ত্বেও, প্রতিবাদ সভা ও মিছিলের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করে। নিজ মনের এই পরিবর্তন সম্পর্কে হেমন্তের চিন্তা :

> সভায় যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না, শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আমি চাই নি। এটা তবে কি রকম ব্যাপার হল? হেমন্ত ভাবে।
>
> নিজের ব্যবহার বড় আশ্চর্য মনে হয় হেমন্তের নিজেরই কাছে, বিশেষত নিজের মনের চাল-চলন. সভায় গিয়ে দাঁড়াবার খানিক পরেই মন যেন বিনা দ্বিধায় বিনা তর্কে কোন বিচার বিবেচনা হিসাব নিকাশ না করেই বাতিল করে দিলে এতদিনকার কঠোরভাবে মেনে চলা রীতিনীতি; এতদিন ধরে যা সে যে-ভাবে ভেবেছে আজ যেন ও-ভাবেও-সব ভাববার দরকারটাই শেষ হয়ে গেছে একেবারে। ...[৫০]

শুধু হেমন্তের নয়, পরিবর্তন ঘটেছে সংসারের সকলের মধ্যে। তার বোন রমার মনেও ওইদিন দারুণ আলোড়ন। ঝিকেলে বান্ধবীর বাড়ি থেকে সে ফিরে আসে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে। মায়ের গান শেখার আমন্ত্রণে তাকে বড় বিপন্ন দেখায়, তীব্র অনিচ্ছা ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে : "আজ থাক গে। গানটান শিখতে আজ ইচ্ছে করছে না মা।" অনুজ জয়ন্তের মধ্যেও দেখা দিয়েছে পরম উত্তেজনা। রাজপথে সংঘটিত জনতা-পুলিসের সংঘর্ষ দেখে আসার এক মারাত্মক প্রস্তাব করে এই কিশোর বালক। মায়ের মুখ থেকে ওইদিন তার বানানো গল্প শুনতে ভালো লাগে না। সারা শহর জুড়ে যখন হাজারো সত্যিকারের গল্প সৃষ্টি হচ্ছে তখন ওইটুকু ছেলের মনেও বানানো গল্পের আর স্বাদ নেই। হেমন্তের মা অনুরূপার মধ্যেও-যে পরিবর্তন আসে নি, তা নয়। তিনিও ওইদিন ছেলেমেয়ের গান শেখা কিংবা পড়তে বসার অনিচ্ছাকে সহজে মেনে নেন। গভীর রাতে গুলিবিদ্ধ হেমন্ত ফিরে আসার পর যখন সে পরদিন আবার মিছিলে যাওয়ার অনুমতি চায়, তখন অনুরূপা অনুমতি দিতে পারে না ঠিক, কিন্তু 'নিষেধের অভিশাপ'ও তার মুখ থেকে আর উচ্চারিত হয় না। মানিকের ভাষায় : "তবে নিষেধের অভিশাপ যে এল না, অনুরূপার মতো ভদ্র স্নেহাতুরা মায়ের এ পরিবর্তন কে অস্বীকার করবে?"[৫১]

ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হলেও রসুল অন্য কিছু ভাবে না। এতটুকু দুঃখ পায় না। শুধু বলে : "বাঁ হাতে সব হয়তো আবার অভ্যাস করতে হবে। সাইকেল চালিয়ে কলেজে যেতে অসুবিধে হবে না এক হাতে কিন্তু—"।[৫২] পিতৃহারা রসুল, মায়ের একমাত্র সন্তান। প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের শয্যায় মাতৃ-আদরের জন্য বুভুক্ষু হয়ে ওঠে। গ্রেপ্তারকৃত অবস্থায়ই পুলিসের চোখ এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে মায়ের সাক্ষাতের জন্য বাড়ি ফেরে, কিন্তু সকাল হওয়ার পূর্বেই হাসপাতালে ফিরে যায়। পালিয়ে এসেও কেন ফিরে যাচ্ছে— এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই রসুলের মতো তরুণদের মনের মধ্যে কী পরিবর্তনের হাওয়া বইছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রসুল বলে : "যাব না? আরও তো কয়েকজন

গ্রেপ্তার হয়েছে, তারা কেউ পালায় নি। ফিরে না গেলে লোকে বলবে না তোমার ছেলে গ্রেপ্তার হয়ে একা পালিয়েছে?"[৫৩] রসুলের মা আমিনাও এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে যায়। রসুলের মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধ, সাহস ও সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের প্রশান্তি— তা তার মায়ের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। রসুলের হাসপাতালে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে আমিনার অনুভূতি :

> কে নিজের ছেলে কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই তার লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে! অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে। আর এমন এক বন্ধুকে সঙ্গে এনেছে রসুল, দু'দণ্ড যার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে রসুলের মতোই সে তার চেনা-জানা, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ-করা সন্তান।[৫৪]

নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত অক্ষয়ের মনোগত পরিবর্তন আরও তাৎপর্যবহ। স্ত্রীর কাছে ওইদিন সে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিল— মদ স্পর্শ করবে না। কিন্তু সন্ধ্যা যত নিকটতর হয়েছে, প্রতিজ্ঞার বন্ধনে তত শৈথিল্য এসেছে। দাম্পত্যপ্রেম তার নিয়মিত অভ্যাসত্যাগের মানসিক শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়ক হয় নি। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রাজপথের আন্দোলন। তারুণ্যের নির্ভীক দৃঢ়তার উষ্ণ স্পর্শে অক্ষয়ের শিথিলবন্ধন-মন নতুনতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। অক্ষয়ের মনে হয় : "সারাদিন রাজপথের ও দৃশ্য দেখার পর মদ খেলে বড়ই নোংরামি করা হবে সেটা।" অতএব অক্ষয় মদ না খেয়েই বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। আন্দোলনকারী তরুণদের প্রতি সহানুভূতিতে মন তার আর্দ্র হয়ে ওঠে : "ওরা কি করছে, কি অবস্থায় আছে, একবার না দেখে গেলে তার চলবে না। গায়ের আলোয়ানটাও দিয়ে যেতে হবে। বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত শীতে একটু কষ্ট হবে তার, কিন্তু বাড়িতে বাকী রাত তার কাটবে লেপের নীচে। ওরা খোলা আকাশের নীচে পথে কাটিয়ে দেবে রাতটা। আলোয়ানটাতে যদি একজনেরও শীতের একটু লাঘব হয়।"[৫৫] এই একাত্মতাবোধের কারণেই শুধু ওই একদিনের জন্যই নয়, ভবিষ্যৎ মদ্যপানের ব্যাপারেও তার মনে এক তীব্র অপরাধবোধ ফণাবিস্তার করে। তার দীর্ঘদিনের অ্যালকোহল-আচ্ছন্ন মস্তিষ্ককোষগুলি ওইদিনের রাজনৈতিক অভিঘাতের তড়িৎস্পর্শে যেন স্বচ্ছ হয়ে যায়। ফলে জীবনভাবনায় পুরোপুরি নবজন্মলাভ ঘটে তার :

> অন্য এক ভয়ঙ্কর নেশাতে একেবারে সচেতন অচেতন মন নিয়ে মশগুল হওয়ার মজাও টের পেয়েছে অক্ষয়, বাঁচার জন্য বাঁচবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা। এই প্রথম ও নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়তো সে খাবে দু'একবার নিজের দুর্বলতায় কিন্তু সেটা দু' একবারের

> বেশী আর খাবে না, কারণ, ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে— গেঁজানো রক্ত।[৫৬]

তীব্র তীক্ষ্ণ ভাবনাস্রোতের আলোড়ন-অভিঘাতে অক্ষয়ের মনোনদীর তীরভূমি ওইদিন ক্ষতবিক্ষত, বিশৃঙ্খল ও পর্যুদস্ত। মদসেবনে অভ্যস্ত পঙ্কনিমজ্জিত তাঁর অন্ধকারের জীবন যেন হঠাৎ আলোর সন্ধান পেয়ে হতচকিত, আত্মবিশ্লেষণ-উন্মুখ। ফলে জীবনসত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় অক্ষয়ের সামনে। সত্য-উচ্চারণে সে অতিশয় উদার, নির্ভীক ও দ্বিধাশূন্য মানস হয়ে ওঠে। স্ত্রীর নিকট স্বীকারোক্তিতে সে বলে :

> ... অন্যদিনের চেয়ে বেশীই হয়তো আজ খেতাম সুধা। কিন্তু এমন ব্যাপার আজ দেখলাম, যাদের মেয়ে-শোঁকা ভাবপ্রবণ ফাজিল ছোকরা বলে জানতাম, তাদের এমন অদ্ভুত মনের জোর দেখলাম, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম সুধা। বুঝলাম যে, আমি যা ভাবি সব ভুল। মদ খেতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু তখনো ভাবছি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরী, ওটা কিসের নেশা? মদ না খেয়েও যদি মানুষের ও-রকম নেশা হ'তে পারে, আমি তবে কেন বোকার মতো গাঁটের পয়সা খরচ করে এই সস্তা বিশ্রী নেশা করি! ওই ছেলেগুলোর জন্য আজ খেতে পারলাম না। ...[৫৭]

মানুষের সার্বজনীন কল্যাণার্থে কতিপয় মানুষের মৃত্যুপণ লড়াইয়ের দৃশ্য অন্য মানুষের মনে কী গভীর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে— তার উদাহরণ এই মদ্যপায়ী অক্ষয়। রাজনৈতিক সংগ্রামে উদ্দীপ্ত রাজপথে সে এমন এক সত্যের সন্ধান পায়, যার স্পর্শে তার পাথরহৃদয় পরিণত হয় স্বর্ণে।

অজয়ের পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ভিন্নভাবে। কলেজপাঠ অসমাপ্ত রেখে হঠাৎ সংসারের দায়িত্বগ্রহণ করায় অজয়ের মনে রয়েছে প্রবল ক্ষোভ। শহরকাঁপানো রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘটনা তবু তাকে টেনে এনেছে, কিন্তু কর্তব্যতাড়নায় "একটু দূরেই থাকে অজয়, তফাত থেকে উদাসীনের মতো দ্যাখে।" তবে তার এই দূরবর্তী অবস্থান কিংবা দ্বিধাযুক্ত মানস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। সংসারদায়িত্বের পিছুটান, ছাত্রত্ব ত্যাগ করে কেরানির জীবনগ্রহণে বাধ্য হওয়ায় অপকর্ষবোধজাত অভিমান— এ সবকিছুই একসময় সে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, যখন অবস্থান-ধর্মঘটকারী ছাত্রসমাবেশের ওপর পুলিসের গুলিবর্ষণের শব্দ তার কানে আসে : "সব ভুলে সে ছুটতে আরম্ভ করে, তার সমস্ত ক্ষোভ অভিমান পরিণত হয় একটিমাত্র ব্যাকুল প্রশ্নে, কি হল, কি হল? ... তফাতে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে সে ভুলে যায়, সোজা চলে যায় ওদের কাছে, ওদের মধ্যে।"[৫৮] ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পরদিন যানবাহন-ধর্মঘটের ফলে

কলকাতা শহর যখন অচল ও গতিহীন, তখন চাকরিচ্যুতির ভয়ে পদব্রজে অফিসগমনের কোনো আগ্রহও অজয়ের মধ্যে আর লক্ষ করা যায় না। পূর্বরাত্রে গুলির শব্দ তার দ্বিধান্বিত মনের যে-সংশয়মুক্তি ঘটিয়েছে তা অব্যাহতই থাকে। অজয়ের অফিসযাত্রার সময় পেরিয়ে যেতে দেখে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয় তার পিতা অনন্ত— মাত্র কিছুদিন পূর্বে যিনি যুদ্ধের আঘাতে চাকরিচ্যুত হয়েছেন। অথচ পিতাকে উদ্বেগাকুল রেখেই অজয় নির্বিকারচিত্তে প্রাক্তন ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে পূর্বের মতো রাজনৈতিক আলোচনায় নিবিষ্ট থাকে। অজয়ের অফিসকামাইয়ের সিদ্ধান্ত শুনে প্রথমে তিনি মানসিকভাবে বেশ বেসামাল হয়ে পড়েন: "অনন্ত কাসতে শুরু করে। কাসতে কাসতে বেদম হয়ে পড়ে। তবু তারই মধ্যে কোনমতে বলে, 'সায়েব খুশী হবে, মাইনে বাড়বে, উন্নতি হবে, আপিস যা।' কাসি থামলে গুটলি-মুটলি পাকিয়ে মরার মতো পড়ে থাকে অনন্ত।"[৫৯] এই অনন্তের মনও একসময়ে পরিবর্তিত হয়। আধঘন্টা পরে একটু সুস্থ হয়ে অনন্ত বলে : "আজ আপিস যেও না। সবাই যখন আপিস যাচ্ছে না, তোমার যাওয়া উচিত হবে না। সবাই যা করে, তাই করাই ভাল।"[৬০] পিতৃআশীর্বাদ নিয়ে অবশেষে অজয় অফিসের পরিবর্তে মিছিলকারীদের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি সংযুক্ত করে। মানিক অত্যন্ত গভীর শিল্পদৃষ্টির অধিকারী বলেই পরিবর্তনের মাত্রাটি কেবল অজয় ও তার পিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। সাধারণ জোয়ারের জল নদী-খাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু বন্যার জল নদীখাল পেরিয়ে-যে নালা ও খানাখন্দেও প্রবেশ করে, সেটাই মানিক দেখাতে চেয়েছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, অজয়ের বিবাহযোগ্য গৃহবন্দি বোন মাধু, পরনের শাড়ি যার ছেঁড়া, বাইরে বেরোনোর জন্য একমাত্র সম্বল শাড়িটি পরে বেরিয়ে আসে। মিছিলযাত্রায় অংশগ্রহণের উদ্দেশে সে বলে : "...দাদাও যাচ্ছ নাকি? চলো তবে আমিও বেরোই তোমাদের সঙ্গে। একটু দেখে শুনে আসি।" [৬১] উপন্যাসের শেষে ত্রিদলীয় যে মিছিল রাজপথ কাঁপিয়ে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, অজয় তার সম্মুখভাগে নিজের স্থান করে নেয়। মনে হয়, "ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে দ্যাখে, সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে।" [৬২]

পরিবর্তনের নানা চিত্র আকঁতে গিয়ে মানিক একটি রাজনৈতিক সত্যকে তুলে ধরেছেন। তা হলো, স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, মৃত্যুভীতি, পারিবারিক সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। কিন্তু এমন একটি সমষ্টিগত রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে মানুষ আর সংকীর্ণ স্বার্থসীমায়

আবদ্ধ থাকে না, সমষ্টির সঙ্গে সে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। উদাহরণ হিসেবে উপন্যাসে উল্লেখিত একাধিক বক্তব্য আমরা উপস্থাপন করতে পারি। পরিবর্তনের কারণেই হেমন্ত ভাবে, "একা উঠে চলে যাওয়া যায় না একার প্রয়োজনে।" কিশোর রজত বলে, "আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক।" আবদুল বলে, "কিসের ডর? আমি তো একা নই।" আবদুল ও রসুল উভয়ের একই অনুভূতি : "আঘাতের বেদনা ও মৃত্যুর সমাপ্তি অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে।" শিবনাথ বলে, "রসুল আমার ভায়ের মতো।" ওসমান তার পুত্রবন্ধু রসুল সম্পর্কে বলে, "ওর মধ্যে হাবিব বেঁচে আছে মালুম হল। ছেলের মতো মনে হল ওকে।" ব্যক্তির সুখ-দুঃখ বেদনা-যন্ত্রণাকে সমষ্টির সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিলিয়ে একাত্ম করে অনুভব করলেই তার তীব্রতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। জীবনের হতাশা-নিরানন্দকে ব্যক্তিসীমার মধ্যে কল্পনা করলেই তা অসহনীয় হয়ে ওঠে, কিন্তু তাকে সমষ্টির সীমাহীনতার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করলেই তা সহনীয় হয়। *চিহ্ন* উপন্যাসের পরিবর্তনশীল হৃদয়গুলোর নবতর বোধে এই উপলব্ধিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তবে এর বিপরীত উদাহরণও উপন্যাসমধ্যে বর্তমান। যশ ও খ্যাতি অর্জনের প্রতিযোগিতা, নেতৃত্বস্পৃহা প্রভৃতি মানুষকে কত হীন, সংকীর্ণ ও জনকল্যাণবিমুখ করে তোলে, এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষের চোরাবালিতে মানুষের অপমৃত্যু কিভাবে অবধারিত হয়ে ওঠে— তারই এক নির্মম করুণ আলেখ্য হয়ে উঠেছে অমৃত মজুমদারের কাহিনী। জাতীয়তাবাদী নেতাদের ভেতরকার যে-অন্তঃসারশূন্যতা, জনমঙ্গলের নামে ব্যক্তিগত প্রতিপত্তিলাভের যে-মোহ, তারই এক বাস্তব রূপ চিত্রিত হয়েছে এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা বসন্ত রায়ের কাছে পুলিস কর্তৃক নির্যাতিত ছাত্রদের দৃঢ় মনোভাব ও অটল সংগ্রামস্পৃহাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। ফলে তিনি তাদের পুলিসি পীড়ন বিস্মৃত হয়ে শান্তভাবে গৃহ প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দেন। এ পরামর্শও তিনি নিজে এসে ছাত্রদের বলার প্রয়োজন মনে করেন না, বরং তার সহকারী অমৃত মজুমদারের মাধ্যমে তা বলে পাঠান। লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণসহ পুলিসের নানাবিধ অত্যাচারের পর নেতার এরূপ আদেশ ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবে অগ্রাহ্য করে। অতঃপর পরামর্শবাহক অমৃত মজুমদার বিষণ্ন, হতাশ, গম্ভীর, পরিশ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে যখন বাড়ি ফেরেন, তখন রাত দশটা। অত রাতে বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই তার। স্ত্রী অরুণা মজুমদারের তীব্র আক্রমণের শিকার হয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে আবারও তাকে পথে বেরোতে হয়।

অরুণা মজুমদার গত দশ বছর যাবৎ তার নেতৃত্বস্পৃহার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, এতদিন পরে মূল নেতার অনুপস্থিতিতে সেই সুযোগ তার এসেছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে তার জীবন অর্থহীন হবে। ছাত্ররা যখন বসন্ত রায়ের নির্দেশ অমান্য করেছে, তখন তার উচিত ছাত্রদের পক্ষাবলম্বন করা। এই পথেই তার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভবপর। স্ত্রীর যুক্তিতে আস্থাশীল হয়ে অমৃত মজুমদার গভীর রাতে পথে নামেন। কিন্তু ছাত্রদের উদ্দেশে নতুন ভাষণদানের সুযোগগ্রহণের পূর্বেই তিনি স্ত্রীর হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনতে পান। অরুণা মজুমদারের হৃদরোগ ও তজ্জনিত মৃত্যুর মূল কারণ : স্বামীর নেতৃত্বস্পৃহা। এ সম্পর্কে তাদের কন্যা বীণার চিন্তাসূত্রটি অনুধাবনযোগ্য :

> ডাক্তার বার বার বলেছিল, সাবধান, সাবধান। এ কোন মরীচিকার লোভে মা সে কথা ভুলে গেল। নিজের মরণ ডেকে আনবার মায়ের অদ্ভুত পাগলামীর কথাই বীণা ভাবে ভাইবোনের সঙ্গে মায়ের মৃতদেহ আগলে বাপের প্রতীক্ষায় বসে থেকে। খাওয়া দাওয়ার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন নিখুঁত সতর্কতা, মনে এত উদ্বেগ অশান্তি ক্ষোভ জমা করবার কি দরকার ছিল? এত পেয়েও সাধ মিটল না, যশ মান প্রতিপত্তির উগ্র কামনায় পুড়তে পুড়তে মরতে হল শেষে? ক্রমে ক্রমে যেন পাগল হয়ে উঠেছিল মা তার বাবাকে বড় একজন নেতা করার জন্য। এতই কি প্রচণ্ড নেতৃত্বের মোহ মানুষের যে বাবার জীবনটা তার ভরে ওঠে আত্মগ্লানি আর হতাশায় তবু তিনি থামতে পারেন না, মাকে তার জীবনটা দিতে হয়। মা যেন তার আত্মহত্যা করেছে মনে হয় বীণার। নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে বীণার গাল বেয়ে, ভাইবোনদের মতো চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না।৬৩

একটি রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব-যে কত সুদূরপ্রসারী, কত বিচিত্র বিস্তৃত ও ব্যাপক হতে পারে তারই অনুপুঙ্খ বিবরণে *চিহ্ন* উপন্যাস সমগ্রতালাভ করেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া কেবল তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ঘটনাধারার সীমায় আবদ্ধ না-থেকে সাধারণ মানুষের জীবনভাবনা ও জীবনোপলব্ধিতেও রেখে যায় এক গভীর পরিণাম-চিহ্ন। মানুষের চেতনালোকের যে স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি বা অগ্রসরতা সেখানে সঞ্চারিত হয় নতুন আবেগের বেগ। চেতনা রাজ্যে তীব্র আলোকসম্পাতের ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে মানবমন গতিময়তা লাভ করে। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আধুনিক যুগের এমন এক শক্তিশালী উপাদান, যার প্রভাব মানবমনের ওপর অত্যন্ত বলিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ ও পরিণামসঞ্চারী।—এ সত্য উন্মোচনেই *চিহ্ন* উপন্যাস গতিলাভ করেছে। রাজনীতি কেবল রাষ্ট্র ও প্রশাসনেই পরিবর্তন সঞ্চার করে না, সমাজজীবন ও সমাজমানসকেও তা আলোড়িত করে প্রবলভাবে। আর সেই সূত্রেই মানবমন তার

তরঙ্গাভিঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে দুমড়ে-মুচড়ে নতুন অবয়ব লাভ করে। মানবমনে দীর্ঘকাল-লালিত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে এই অভিঘাত কম্পন সৃষ্টি করে। ফলে অনেক সময় মূলসমেত উপড়ে ফেলে সংস্কারের ভিত্তি-উৎস।

এ-উপন্যাসে রাজনীতির মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানিকের স্বচ্ছচিন্তার স্ফুরণও লক্ষণীয়। মানিকের চূড়াস্পর্শী রাজনীতিমনস্কতারও উৎকৃষ্ট উদাহরণ এ-উপন্যাস। বিশৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়ে মহৎ রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ যে অসম্ভব সেই সহজ সত্যটি কিশোর রজতের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। নিপীড়ক ঘোড়সওয়ার পুলিসকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলার ইচ্ছা যখন নারায়ণের ক্ষুব্ধ মনে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন সেই স্বেচ্ছাচারী ভাবনার বিরুদ্ধে রজতের মনোভাব অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ। রজত বলে, "... শুধু ইচ্ছে করলেই তো হয় না? যা ইচ্ছে তাই করলে চলে নাকি!" রজতের কণ্ঠে আরও পরিপক্ব রাজনৈতিক বোধের উচ্চারণ ঘটে, যখন সে বলে :

> আমরা মারামারি করতে গেলেই তো ওদের মজা। তাই তো ওরা চায়। আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক। ওরা জানে, বাড়াবাড়ি করলে চাদ্দিকে কি কাণ্ড বাধবে। দেখছেন না রাগ চেপে শুধু খুচ্‌খুচ্‌ ঘা মারছে? আমরা যাতে ক্ষেপে যাই? ইচ্ছে করলে তো দু' মিনিটে আমাদের তুলো ধুনো করে দিতে পারে, দিচ্ছে না কেন? আমরা যেই মারামারি করতে যাব, বাস্‌, আমরা আর দেশের সবাই থাকব না, শুধু আমরা হয়ে যাব। লোকে বলবে আমরা দাঙ্গা করে মরেছি।[৬৪]

কিছু রগচটা উগ্র মনোভাবাপন্ন অসংযতমনস্ক লোকের বাড়াবাড়িতে প্রায়শ রাজনৈতিক আন্দোলন তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার পরিবর্তে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে আটকে গিয়ে শত্রুর হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের সুযোগ করে দেয়— অতি সাম্প্রতিকসময়েও আমরা এ-ধরনের একাধিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। মানিকের কাছে রাজনৈতিক আচরণের ত্রুটিপূর্ণ এই দিকটি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

এ-বিষয়টি শ্রমিকদের মনোভাবের মধ্য দিয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাতভর রাজপথে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটের ঘটনাটি কলকাতার কারখানাশ্রমিক পরিবহনশ্রমিক সকলের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। কোনো সংগঠিত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশের অপেক্ষা না-করে পরদিন সকালে সকলের মধ্যেই কর্মবিরতির মাধ্যমে প্রতিবাদ ও একাত্মতা ঘোষণার উপলব্ধি জাগে। একসময়কার ট্রামকন্ডাক্টর, বর্তমানে কারখানাশ্রমিক, ওসমানের মনোভাবনার গতিপ্রকৃতি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

> ...এক অফুরন্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অনুভব করে ওসমান , সবাই যখন এক হয়ে গেছে এগোবার প্রতিজ্ঞায় , নির্দেশ দিতে হয় নি নেতাদের, এমন অকারণ অর্থহীন অত্যাচারের প্রতিবাদও সবাই করবে এক হয়ে, কাউকে বলে দিতে হবে না। এ সিদ্ধান্তের একটা অদ্ভুত সমর্থন অনুভব করে ওসমান, শুধু তার ভিতরের বিশ্বাসে নয়, বাইরে থেকেও যেন বহু লোকের সমর্থন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে।[৬৫]

ঘরের বাইরে গিয়ে বস্তির বহুকণ্ঠের কলরবের মধ্যে ওসমান তার অনুভবেরই বাস্তবায়ন দেখতে পায়। বস্তির লোকেরা নিজের থেকেই কাজে যোগদান না-করে উত্তেজিত রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। ফলে অসংখ্য শ্রমিকের সঙ্গে নিজ ভাবনার একাত্মতা অনুভব করে ওসমান : "ঘরের কোণে শুধু তার একার মনে সঙ্কল্প জেগেছিল, আজ সে কাজে যাবে না। ঘরের বাইরে এসে সে দেখেছে শুধু তার একার নয়, সকলের মনেই আপনা থেকে সেই সঙ্কল্প দেখা দিয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তবে আর হাজার হাজার কেন, সংখ্যাহীন কত মনের সঙ্গে তার মন হাত মিলিয়েছে কে বলতে পারে!"[৬৬]

তবে চিন্তার ঐক্য ছাড়া অনৈক্যের ঘটনাও দুর্লক্ষ নয়। ধর্মঘটের সুযোগে চিহ্নিত গুণ্ডারা লুটপাটের অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। এবং সেক্ষেত্রেও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সচেতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় শ্রমিকশক্তি। বস্তি অঞ্চলের গুণ্ডা হানিফ যখন দোকান ভাঙার প্রস্তাব করে, তখন তার প্রতিবাদে ওসমান বলে, "আমরা গিয়ে দোকানপাট ভাঙব, গুণ্ডাদের লুট-পাটের সুবিধা হবে। ও কি একটা কথা হল?" সে আরও চেঁচিয়ে সকলের উদ্দেশে বলে, "দোকানপাট ভাঙার কথা ওঠে কিসে? সভা কর, মিছিল কর, হরতাল কর। দোকান বন্ধ থাক। বাস্।"[৬৭] শ্রমিক সচেতনতার এ এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ। রাজনৈতিক সংগ্রাম-আন্দোলনকে সঠিক খাতে বয়ে নিতে হলে বিশৃঙ্খলা-অরাজকতার পথ পরিহার করা আবশ্যক। গুণ্ডাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রস্তাবের বিপক্ষে ওসমানের দৃঢ়কণ্ঠ সে-সত্যই উচ্চারণ করে।

শ্রমিকসচেতনতার পাশাপাশি কৃষকসংগ্রামের কথাও এ উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় কলেজ-ছাত্র রসুল পড়া ছেড়ে দিয়ে নিজ গ্রামে গিয়েছিল, কয়েকজনকেও যদি বাঁচাতে পারে—এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার 'রিলিফ সেন্টার' খোলার উদ্যোগকে গ্রামের জমিদার নিজের চোরাকারবারির ব্যবসার পক্ষে এক আতঙ্কজনক অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করায় রসুলকে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়। প্রথমে রসুলকে ওই ধরনের প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত করার জন্য জমিদার তার কর্মচারী পাঠায়। কিন্তু রসুল কর্মচারীর নিষেধ অমান্য করে অগ্রসর হলে

জমিদার ষড়যন্ত্রমূলক পুলিসি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মানিকের ভাষায় :

> তবু রসুল থামে নি। চালা তুলেছিল, খাদ্য যুগিয়েছিল, ভলান্টিয়ার গড়েছিল—নিজে পেছনে থেকে। খিচুড়ি বিতরণ আরম্ভ করার আগের দিন বিকালে লালদীঘির ধারের মাঠে সভার আয়োজন করেছিল— নিজে পেছনে থেকে। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ডাকা সেই সভায় কি করে দাঙ্গা বেধেছিল রসুল জানে না, সভার এক কোণে দাঙ্গা বাধার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে লাল পাগড়ীর আবির্ভাব হয়েছিল তাও সে বুঝতে পারে নি। লাঠির ঘায়ে কপাল ফাঁক হয়ে হাজার ফুলকি দেখে ঘুরে পড়বার ঠিক আগে এক লহমার জন্য লাল পাগড়ীর নীচেকার মুখটি সে দেখেছিল। আজও সেই পৈশাচিক আক্রোশে বিকৃত মুখের ছাপ তার মনে আঁকা হয়ে আছে।[৬৮]

শোষকশক্তির এক সার্বজনীন জঘন্য রূপকে এখানে মানিক অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে শোষকশক্তি সবসময় তার শোষণপ্রক্রিয়াকে কন্টকমুক্ত রাখার জন্য হীন ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। রাষ্ট্রযন্ত্রকেও ব্যবহার করে নিজ স্বার্থের অনুকূলে। মানুষের বেঁচে থাকা-না-থাকা, কল্যাণ-অকল্যাণসবকিছুর গুরুত্ব তার শোষণের স্বার্থযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক, মানিক কলকাতার রাজপথের আন্দোলনের সূত্রে গ্রামের এই ঘটনাটি উল্লেখ করে একদিকে যেমন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গ্রাম-শহরের বৈশিষ্ট্যের ভেতরকার অভিন্নতাকে উন্মোচিত করেছেন, তেমনি এর মধ্য দিয়ে তিনি শোষক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়ক ভূমিকাকেও সমগ্রতাস্পন্দী করে তুলেছেন। গ্রামের আরও একটি অত্যাচারমূলক ঘটনার বিবরণ এ উপন্যাসে রয়েছে। যাদব-কন্যা রানী জনৈক শোষক-প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যভিচারের শিকার হলে সমগ্র গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে তাকে উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় গ্রামবাসীর ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রকাশ ঘটলেও তার স্থায়িত্ব-যে ক্ষণিকের তা-ও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় যাদব পরিবারকে গ্রাম ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু ওই ঘটনা যাদবের মনে এক নতুন সত্য উন্মোচন করে। নিজ শ্রেণীভুক্ত চাষীদের সম্পর্কে তার আবাল্যলালিত অভিজ্ঞতায় নতুন আবেগ স্পর্শ করে :

> খিচুড়ি খেতে বসে যাদবের চোখে হঠাৎ জল আসার উপক্রম হয়। তার মতো গরীব হাঘরে তুচ্ছ মানুষের জীবনেরও যে দাম আছে দশজনের কাছে, তার মতো লোকের মেয়ের সম্মান যে নিজের মেয়ের সম্মানের মতো হতে পারে দশজনের কাছে, এ জ্ঞান এ অভিজ্ঞতা তাকে প্রায় অভিভূত করে রেখেছে প্রথমাবধি। চিরকাল নিজেকে সে জেনে এসেছে একান্ত অসহায়, দুর্ভিক্ষে হাড়ে মাসে টের পেয়েছে সে বা তার পরিবারের বাঁচন মরণে কিছু এসে যায় না জগতের কারো। আজ সে জেনেছে তা সত্যি নয়। ডান হাতে চোট লেগেছে, মুখে খাবার তুলতে কষ্ট হয়। কিন্তু সে বেদনা যেন গায়ে লাগে না যাদবের, ব্যান্ডেজের নীচে মাথার ক্ষতটা যে দপদপ করছে সে যন্ত্রণাও

> বাতিল হয়ে গেছে তার কাছে। ভিতরে একটা ক্ষোভ আর আক্রোশকেই যেন জাগিয়ে বাড়িয়ে চলছে শরীরের আঘাতগুলির যন্ত্রণা। সে ফিরে আসবে, বৌ-ছেলে-মেয়েকে গণেশের কাছে রেখে সে ফিরে আসবে তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সাথে যোগ দিতে।

> ভাগচাষের বাটোয়ারা আর বেগার খাটা নিয়ে যে লড়াই বাড়ছিল দিন দিন, যে হাঙ্গামার সুযোগে সাঁজ সন্ধ্যায় মেয়েকে তার টেনে নিয়ে যাবার সাহস ওদের হয়েছে, তাতে ভাল করে যোগ দেয় নি বলে আপসোস হয় যাদবের। তাকে যারা আপন ভাবে, তার জন্য বাঁচন মরণ তুচ্ছ করে, তাদের ব্যাপারে সে উদাসীন ছিল কেমন করে?[৬৯]

শহরকেন্দ্রিক ছাত্র-যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমান্তরালে পল্লীকেন্দ্রিক ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের অর্থনৈতিক ন্যায্যদাবির আন্দোলনও-যে পরিপক্ব হয়ে উঠেছে, শিল্পী মানিকের কাছে তা যেমন অজ্ঞাত ছিল না, তেমনি গুরুত্বহীন বলেও বিবেচিত হয় নি। যাদব পরিবারের ঘটনায় কৃষকসমাজের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও শোষকশক্তির দাম্ভিক অত্যাচার— এই উভয় বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। যাদব পরিবারের গ্রামত্যাগ-যে কৃষকসমাজের পরাজয় নয়, তাও চমৎকার যুক্তিসহ জনৈক কৃষকনেতার বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রাম থেকে পালানোর সময় যাদবের মনের মধ্যে সৃষ্ট গ্লানিবোধ নিরসনকল্পে কেশব বলে :

> পালাচ্ছো না তো, পালাবে কেন। ওরা তো ছেড়ে কথা কইবে না, কদিন তাণ্ডব চলবে চারদিকে। তোমাদের ওপর ঝাল বেশি, প্রথম ধাক্কাটা পড়বে তোমাদের ওপরে। তোমরা তাই কটা দিন নিরাপদ জাগায় গিয়ে থাকবে। অবস্থা ভাল হলে, দেশের লোক প্রতিবাদ শুরু করলে অতটা যা তা করা চলবে না...[৭০]

কৃষক আন্দোলনের বিজয় সম্পর্কে কেশব-কণ্ঠে যে-আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে, তা মানিকের আশাপুষ্ট মনেরই প্রতিধ্বনিমাত্র। দ্বিতীয় মহাসমরোত্তর রাজনীতির সেই উত্তাল দিনগুলোতে শ্রমশীল মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিজয় সম্পর্কে মানিক দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল ছিলেন। সেই আস্থা ও আশার 'চিহ্ন'ই এ-উপন্যাসের সর্বাঙ্গে স্ফুটমান।

চিহ্ন উপন্যাসের গঠনকৌশল, ভাষা প্রভৃতিও মানিকের শিল্পিব্যক্তিত্বের এক মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। শিল্পিজীবনের সূচনালগ্নে *পদ্মানদীরমাঝি* , *পুতুলনাচের ইতিকথা* রচনার সময়ে তাঁর শিল্পিব্যক্তিত্বে যে-অসাধারণ প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য লক্ষ করা গিয়েছিল, রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার পর একমাত্র *চিহ্ন* উপন্যাসেই অনুরূপ শিল্পশ্রীর প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে মানিকের

গঠনবিন্যাসগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে-আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে, *চিহ্ন* উপন্যাসের কাঠামোসৌকর্যে, রীতিভাঙনের সার্থক প্রয়াসে তারই সফল পরিণতি আমরা লক্ষ করি। স্মরণীয় যে, উভয় উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক গ্রন্থদ্বয়কে উপন্যাস বলা সঙ্গত কিনা তাই নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। ভাষা ও সংলাপ ব্যবহারে, রূপকের সার্থক আশ্রয়গ্রহণে— উভয় উপন্যাস মানিকের ঔপন্যাসিক শক্তির চূড়াস্পর্শ করেছে। *চিহ্ন* উপন্যাসের প্রথম বাক্য : 'প্রাণ ধুক্‌পুক্‌ করে না গণেশের।' কিংবা , 'সেই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে।' বা, 'ভয় ভাবনা চাপা পড়ে গেছে আড়ালে।' বা, 'এ কেমন গণ্ডগোল যেখান থেকে কেউ পালায় না।' ইত্যাদি সংকেতধর্মী সংলাপসৃষ্টির পাশাপাশি গণেশের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ারের রূপকে বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একই সাথে ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবতা শিবঠাকুরের প্রসঙ্গ এসেছে ওই রূপকেরই আশ্রয়ে। ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যক্ষ করে ভাটার নদীতে জোয়ারের আগমন কল্পনায় তাই গণেশের মনোভাবনা চিত্রকল্পময় হয়ে ওঠে। তার মনে হয় : 'স্বয়ং পাগলা শিবঠাকুর যেন আসছেন নাচতে নাচতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে সাদা ফেনার মুকুট পরে।' ছাত্রদের অবস্থানগত অনড়তা দেখে গণেশের মনে তাই প্রশ্ন : 'এ কেমন গতিহীন গর্জন, সাদা ফেনার বদলে এ কেমন কালো চুলের ঢেউ।' গুলিবিদ্ধ গণেশ তাই মৃত্যু মুহূর্তেও প্রশ্ন রেখে যায় : 'এরা এগোবে না বাবু?' গণেশের মৃত্যুকালীন এ প্রশ্নই সমগ্র উপন্যাস জুড়ে অন্তরালবর্তী সুরের মতো যেন ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, অনুরণিত হতে থাকে। এবং উপন্যাসশেষে এই প্রশ্নেরই মীমাংসাস্বরূপ কোটালের জোয়ার সদৃশ প্রাণবন্যার অগ্রসরতায় তা বিচিত্র মাত্রাবোধক হয়ে ওঠে। গণেশ প্রাণের জোয়ার চেয়েছিল, কিন্তু সে তা দেখে যেতে পারে নি— সেই জোয়ার দেখেছে তার বাবামা ভাইবোন। এও যেন এক রূপক। এক প্রজন্ম যে-স্বপ্নকল্পনায় আত্মত্যাগ করে, অন্য প্রজন্ম এসে সেই আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা দেখতে পায়— রাজনীতিতে, মানবজীবনচক্রে, সভ্যতার ঘূর্ণিপাকে— এ-ই যেন স্বাভাবিক।

৫

জীয়ন্ত উপন্যাসের গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল যদিও ১৯৫০ সাল; কিন্তু এ-উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালের শারদীয় সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৫৩) থেকে ১৯৪৯ সালের মার্চ-এপ্রিল (চৈত্র ১৩৫৫) পর্যন্ত *পরিচয়*-এ। প্রথমে নাম ছিল '*কলমপেষারইতিকথা;* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে নাম বদলে *জীয়ন্ত*

রাখা হয়। লেখকের কৈফিয়ৎ হিসেবে বলা হয় : "গত সংখ্যায় কলমপেষার ইতিকথা' নামে উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছিল। নামটি আমার পছন্দ হয়নি। শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করি, ভুলক্রমে বাতিল নামটিই ছাপা হয়ে যায়।" (পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৩, পৃ ৩০১)। ১৯৫০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসটির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়। যেমন, *পরিচয়ের* চৈত্র ১৩৫৫ সংখ্যায় উপন্যাসটির প্রথম ভাগ শেষ হয় যখন পাঁচু ও দুকলি শহরে গিয়ে ঘর বাঁধে, পাকাও তাদের সঙ্গ নেয়। পাঁচু কারখানায় চাকরিতে ঢোকে, আর পাকা প্রাইভেট টিউশনি ইত্যাদির সাহায্যে অন্নবস্ত্রের একটা সংস্থান করে ছাত্র-রাজনীতিতে প্রবেশ করে। অথচ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় দেখা যায়, লেখক অনেক ঘটনা বাদ দিয়েছেন। *পরিচয়ে* ১৩৫৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যার কিস্তি যেখানে শেষ, গ্রন্থের পরিসমাপ্তিও ঘটে সেখানে। আটুলিগাঁতে পুলিস হানা দেয়ার পর শাকখেতে লুকানো দুকলিকে নিয়ে জ্ঞানদাস যেখানে সরে পড়ে, বই সেখানে শেষ। অর্থাৎ ১৩৫৫-র শ্রাবণ থেকে চৈত্র পর্যন্ত সংখ্যাগুলির রচনা পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থে 'প্রথম ভাগ'-এর কথাও আর উল্লেখ নেই। স্মরণীয় যে, ১৩৫৫-র মাঝামাঝি সময় থেকে পত্রিকার প্রকাশ এবং উপন্যাসের কিস্তি প্রকাশ উভয়ই কিছুটা অনিয়মিতহয়েপড়ে।[৭১] গ্রন্থে ওইসব ঘটনা বাদ পড়ার এটাও হয়ত কারণ।

জীয়ন্ত উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯২৬–২৮ সাল।[৭২] স্থান মেদিনীপুর শহর ও তার আশপাশের গ্রাম। উপন্যাসের নায়ক প্রকাশ তথা পাকা উপন্যাসের শুরুতে (অর্থাৎ ১৯২৬ সালে) নবম শ্রেণীর ছাত্র। মাতৃহারা পাকা মাতুলালয়ে থেকে লেখাপড়া করছে। তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপন্যাসে যে-পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা হলো : অত্যন্ত দুরন্ত, সেক্সের বই পড়ে, বিড়ি-সিগারেট-হুকা টানে, অস্পৃশ্য বাগদীপল্লীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে তাড়ি খায়, এমনকি নিষিদ্ধ পল্লীতেও কৌতূহলবশে গমন করে, ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, নির্জন নদীতীরে বাঁশি বাজিয়ে কিংবা নাটক দেখে বা কীর্তন শুনে রাত দুপুর পার করে বাড়ি ফেরে, ব্যায়ার শেখার জন্য সমিতিতে যোগ দেয় ইত্যাদি। অর্থাৎ ওই বয়সের দুরন্তপনার সকল প্রান্তই সে সবলে আঁকড়ে ছিল। আবার মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহায্য করাও তার স্বভাববৈশিষ্ট্য। ওই অল্পবয়সেই তার মধ্যে গড়ে উঠেছে কঠোর ব্যক্তিত্ব। গোপন সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও কৌতূহলবশত সে তাদের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে মারাত্মক ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েও সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের কোনো গোপন তথ্য সে প্রকাশ করে না। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত

জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিলে পাকা-চরিত্রের সঙ্গে তার কতকগুলো সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর। মানিকের মাতৃবিয়োগ ঘটে ১৯২৪ সালে; তখন তাদের পারিবারিক বাস ছিল পিতার কর্মস্থল টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইলে মানিকের জীবন ছিল দুরন্ত। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর টাঙ্গাইলের বাস উঠে যায়। অতঃপর মানিক কিছুদিন মধ্যমভ্রাতার নিকটে থেকে কাঁথি মডেল হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন। তারপর যান মেদিনীপুরে বড়ো বোনের কাছে। তার বাবাও বদলি হয়ে মেদিনীপুরে যান। মানিক সেখানে প্রায় দু বছর থাকেন এবং মেদিনীপুর জিলা স্কুল থেকে ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। মেদিনীপুরে মানিক আখড়ায় কুস্তি শিখতেন, দলবদ্ধ হয়ে আগুন নেভাতে যেতেন, ভালো গান গাইতেন— সেকারণে কখনও কখনও হরিসভায় ডাক পড়ত, বাঁশিও বাজাতেন। ম্যাট্রিক পাশের পর বাঁকুড়ায় যান। সেখানে হোস্টেলে থেকে ওয়েসলিয়ন মিশন কলেজে পড়েন। ওই কলেজের ছাত্র থাকাকালে সিগারেট খেতেন, মদ্যপান করতেন, বাঁশি বাজাতেন; ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল ওই সময়। ওই সময়ই এক বন্ধুর মাধ্যমে অনুশীলন পার্টির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। ১৯২৮ সালে ওই কলেজ থেকে মানিক আইএসসি পাশ করেন। পাকার মতো মানিকের জীবনেও যে কিশোরবয়সে নিষিদ্ধপল্লীর সংসর্গ ঘটেছিল তার ইঙ্গিত ডায়েরির পাতায় পাওয়া যায়।[৭৩] পাকা চরিত্রে মানিকের মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার জীবনেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।[৭৪] মালিনী ভট্টাচার্যের উক্তিও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> ... ১৯২৫ সালে মানিক ছিলেন জীয়ন্তর পাকার মতোই সদ্য মা-হারা কিশোর; তাঁরা তখন সপরিবারে মেদিনীপুরেই থাকতেন। এখান থেকেই ১৯২৬ সালে মানিক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কুড়ি বছর বাদে 'পরিচয়ে'র জন্য জীয়ন্ত লিখতে বসে কিছুটা নিজের স্মৃতি থেকেও তিনি নিশ্চয়ই সমকালীন গণআন্দোলনগুলির আদি ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করছিলেন। তাই জীয়ন্তের মধ্যে আত্মজীবনীর ঈষৎ রেশ হয়তো আছে। পাকা বড় হয়ে তাঁরই মতো লেখক হবে, এটা একেবারে গোড়ায় তাঁর পরিকল্পনা ছিল বলেই কি প্রথমে উপন্যাসের নাম রাখেন কলমপেষার ইতিকথা?[৭৫]

প্রথমে এরূপ পরিকল্পনা থাকলেও পরবর্তীসময়ে তা–যে পাল্টে গেছে, তার প্রথম প্রমাণ উপন্যাসের নাম পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসে পাকা প্রথমে কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকলেও ধীরে ধীরে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। পাকাকে নিয়ে উপন্যাস শুরু হলেও কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাকাকে ছাপিয়ে কালীনাথদের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের কর্মকাণ্ড, অহিংস জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বনাম সহিংস স্বাধীনতাসংগ্রামের রাজনৈতিক বিতর্ক, পাঁচুকে কেন্দ্র করে আটুলিগাঁয় জমিদারের

অত্যাচারবিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ই প্রধান হয়ে উঠেছে। উপন্যাস যত অগ্রসর হয়েছে পাকা তত যবনিকার অন্তরালে চলে গেছে।

এ-উপন্যাসে মুখ্যস্থান দখল করে আছে সন্ত্রাসবাদী সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলি। এছাড়া আছে গ্রামে জমিদারের অন্যায়-অত্যাচারবিরোধী বা খাজনাবিরোধী আন্দোলন, জমিদারের পক্ষে পুলিসের অবস্থানগ্রহণ, সন্ত্রাসবাদ দমনে পুলিসের ব্যাপকাকারের নির্যাতন, জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা,[৭৬] ব্রিটিশ প্রশাসকদের অহম চরিতার্থতাকল্পে কৌশলী কার্যক্রম পরিচালনা, ধনিক শিল্পপতিদের শোষণের স্বার্থরক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজনৈতিক সহিংসতা সৃষ্টি, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টির পেছনে শোষণের স্বার্থ প্রভৃতি। স্মরণীয় যে, ১৯২১ সালে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করলে তিনি ঘোষণা দিয়ে ওই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে সমগ্রদেশের (তৎকালীন ভারতবর্ষ) স্বাধীনতাকামী যুবমানসে যে-হতাশা, ক্ষোভ ও বেদনা ধূমায়িত হয়ে ওঠে, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদ তারই পরিণতি। জনতার একাংশের মধ্যে গান্ধী-সম্পর্কিত শ্রদ্ধাবোধ এবং গান্ধীকে মহামানব কল্পনার বিপরীতে ক্ষুব্ধ যুবকদের গান্ধী-সম্পর্কিত বাস্তব বিশ্লেষণের মধ্যেই সহিংসতার যুক্তি প্রকট হয়ে ওঠে। সুরেন ঘোষালের মেয়ের বিয়েতে ডাক্তার রায়চৌধুরী, ভবতোষ প্রমুখেরা গান্ধীকে যখন মহামানবের আধ্যাত্মিক স্তরে তুলে দেয়, তখন তরুণ অমিতাভ তাকে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে এনে বলে :

> ... অমন একটা মানুষের নামে যা-তা রটাতে ভাল লাগে না। ভারতের যুগ-যুগান্তের জ্ঞানকর্মের সাধনা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে থাকে, তাঁকে শত শত প্রণাম। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তাহলে রাজনীতি করতে আসেন কেন? চল্লিশ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে রাজনীতি, সেটা শুধু একটা সাইড লাইন হিসাবে গ্রহণ করছেন, এ কথা বললে যে তাঁর মত মহাপুরুষকে অপমান করা হয় ভবতোষবাবু! তাছাড়া দেখুন, তাঁর নীতি বুঝতে হাবুডুবু খেতে হয়, কূল-কিনারা মেলে না, একেবারে অবতারের লীলাখেলার সামিল করে তাঁর মত আর পথকে সমর্থন করতে হয় ডাক্তারবাবু। মানুষটা দেশের জন্য এত করেছেন এভাবে তাঁকে অপমান করা কি উচিত? তার চেয়ে তিনি যখন রাজনীতি করেন তাঁকে নিছক রাজনৈতিক নেতা বলে ধরে নিলেই গোল থাকে না। আমরা তাহলে নিশ্চিত হয়ে তার নীতি বিচার করতে পারি, তার পথ ঠিক না ভুল তাই নিয়ে ঝগড়া করতে পারি![৭৭]

অসহযোগ আন্দোলন কেন 'বিপথে যাওয়ার নামে থামিয়ে দেওয়া' হলো; তার

কারণ কি জনগণের অসংযম উচ্ছৃঙ্খলতা, না নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা বা ভুল সিদ্ধান্ত, নাকি আন্দোলনটাই ভুল, জনগণ কি রাজনীতি এতটুকুও বোঝে না, কেবল নেতারাই রাজনীতি বোঝেন— এসব বিতর্কে পক্ষে-বিপক্ষে দু-ধরনের মতই পাওয়া যায়। গান্ধীকে যাঁরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করেন, জনগণের রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁরা কোনো শ্রদ্ধা পোষণ করেন না। অপরপক্ষে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল মনোভাব নিয়ে অমিতাভ বলে :

> স্বাধীনতা চাই, এটুকু তো বোঝে? বৃটিশ শাসন ধ্বংস করা চাই, এটুকু তো বোঝে? মুখ বুঁজে মার খেলে স্বাধীনতা আসে, এ রাজনীতি তারা বুঝতে পারে না, তা ঠিক। কোনদিন বুঝতে পারবেও না। যে মারে তাকে মারতে হয়, এই সোজা সত্যটা তারা বোঝে। চিরকাল তাই বুঝবে।[৭৮]

অমিতাভের এই বক্তব্যে এভাবে গান্ধীর অহিংস নীতির প্রতি তীব্র-তীক্ষ্ণ কটাক্ষ এবং সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির যুক্তিযুক্ততা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসে আমরা সন্ত্রাসবাদী দুটি গ্রুপের অস্তিত্ব ও দুটি সন্ত্রাসমূলক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। নারায়ণের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ থানার দারোগা নলিনীর স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কার ছিনতাই করে, অপরদিকে কালীনাথের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ ব্রিটিশ প্রশাসক লিটনের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে সংগ্রহীত ত্রিশ হাজার একাশি টাকা ভুবনের বাড়ি থেকে ডাকাতি করে। উভয় ঘটনাই সফল হয়, কিন্তু শেষোক্ত ঘটনাটি নির্বিঘ্নে সমাধা হয় নি। ওই ঘটনায় পুলিসের সঙ্গে সম্মুখসমরে অমিতাভের মৃত্যু ঘটে। পাকা ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত না হলেও সন্দেহক্রমে ভয়াবহ পুলিসি নির্যাতনের শিকার হয়। শেষোক্ত ঘটনার পর পুলিসি টহল, গোয়েন্দা তৎপরতার তীব্রতা, সন্দেহভাজনদের হয়রানি প্রভৃতি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি সন্ত্রাসবাদীদের কার্যক্রমেও আসে সূক্ষ্ম ও নিপুণ গোপনীয় কৌশলের ঘন আবরণ। সেই গোপন কৌশলে কানাই কিভাবে পিস্তল পাচার করে, কিভাবে পাঁচুর মাধ্যমে পাকার পিতার সরকারি রিভলবার কালীনাথদের হস্তগত হয়, আটুলিগাঁর পুরনো বিপ্লবী শ্যামল জানার কুটির হয়ে ওঠে গোপন মিলনকেন্দ্র— সেসবকিছুর বর্ণনার মাধ্যমে কালীনাথদের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপটির কার্যক্রম অব্যাহত থাকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতসহ উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে নতুন কোনো অ্যাকশন প্রোগ্রাম সংঘটিত হয় না বা এ-ধরনের কোনো পরিকল্পনার কথাও আর শোনা যায় না।

এ উপন্যাসে পাকা চরিত্রকে উপস্থাপন করা হয়েছে কালীনাথদের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপটির কার্যক্রমের সঙ্গে সমান্তরাল রেখাচক্রে। যৌনবিজ্ঞান ও যৌনতামূলক

গ্রন্থপাঠে আগ্রহী, তামাকসেবী, নিষিদ্ধপল্লীর প্রতি কৌতূহলী, বংশীবাদক, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা-কোলাহলের পাশাপাশি নির্জনতাপ্রিয় একটি দুরন্ত খেয়ালী কিশোরের সর্ববিধ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যে-পাকা-চরিত্রকে আমরা উপন্যাসের শুরুতে পাই— বাহ্যিকদৃষ্টিতে অনেক দুশ্চরিত্রমূলক উপাদান, বয়স অপেক্ষা পরিপক্বতা ও কাঠিন্য তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেলেও অন্তর্গত সত্তায় সে অত্যন্ত পবিত্র, সৎ, আবেগময়, ভালোবাসার কাছে নম্র অসহায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও দায়িত্বশীল। তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গেলে তাকে 'ফাজিল ছোকরা' বলে মনে করার কোনো কারণ থাকে না। নানা গুণে গুণান্বিত এই কিশোরকে কালীনাথ নিজের দলভুক্ত করে তার ব্যায়ামাগারে ভর্তি করে। কিন্তু কৈশোরক চঞ্চলতায় এক রাতে পাকা নিতান্ত কৌতূহলবশত নিষিদ্ধপল্লীতে গমন করলে এবং বাগদীবস্তির চোলাই মুখে নিলে কালীনাথ তাকে দলচ্যুত করে। দুশ্চরিত্রের অভিযোগে কালীনাথ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে পাকার মধ্যে যে-কৈশোরক-আবেগ উথলে ওঠে তাতে তার এক ভিন্নতর পরিচয় সুস্পষ্ট হয় :

> কালীনাথ গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকে। সরল হলেও বোকা নয় পাকা। সে জানে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কালীনাথ ভাবছে, এ তার চালাকি। বিশ্বাস করলেও তাতে দোষ কাটানো যায় না। বেশ্যা বাড়ি যাওয়াটাই কম গুরুতর অপরাধ নয় এবং তাড়ির ভাঁড় ঠোঁটে ঠেকানো। কিন্তু হৃদয় যে এদিকে তার প্রচণ্ড আবেগে ঠেলে উঠছে, কোন মতে মানতে চাইছে না আজ থেকে ক্লাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে যাবে। মাঝখানে কয়েকদিন একটু উদাসীন ভাব এসেছিল, খানিক আগে পাকা নিজেও জানত না ক্লাবের জন্য তার এত মায়া, ক্লাব ছাড়তে গিয়ে মনে হবে সব ফুরিয়ে গেল, সর্বনাশ হল তার। দুহাতে ক্লাবের মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছা হবে।
>
> সত্যি বলছি কালীদা, আমার ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়নি। কোন দিন এক ফোঁটা তাড়ি আমি গিলিনি। আমায় একটা চান্স দিন!
>
> আর্ত আবেদন জানায় পাকা।[৭৯]

অথচ কারও কাছে আর্ত আবেদন জানানোর মতো দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী পাকা নয় তার আবেগদীপ্ত মনেরই এ-এক দুর্বল প্রকাশ। তার এই আবেগ-দুর্বলতার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন তার অভিমানাহত মনের অনুভবরাশি ভালোবাসার অনুকূল স্পর্শে ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় :

> সুধা বলে, তুমি সত্যি অধঃপাতে গেছ, পাকা।
> বেশ করেছি। একশোবার অধঃপাতে যাব। তোমাদের কি?
> পড়ার টেবিলে দু'হাতে মাথা গুঁজে দেয় পাকা।

> সুধা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। পাকা কাঁদছে! তাকে কখনো কাঁদতে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না সুধা।
> পাকাও তবে কাঁদে? ওর কাঁদুনে মুখখানা দেখতে বড় সাধ হয় সুধার।
> কি হল? চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ধরে সে তুলবার চেষ্টা করে পাকার মুখ।
> যাও, যাও, চাই না তোমাদের। আমায় কেউ ভালবাসে না, দেখতে পারে না। কাউকে চাই না আমি।[৮০]

তবে কালীনাথ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের অপমান-অভিমান পাকাকে বৈরিভাবাপন্ন করে তোলে না। বরং কালীনাথদের দলের প্রতি তার আকর্ষণ, আবেগ ও সহানুভূতি বিস্ময়করভাবে অব্যাহতই থাকে। আটুলিগাঁর গভীর জঙ্গলে কালীনাথ-গ্রুপের বন্দুক প্রশিক্ষণের শব্দ-যে প্রধান সড়ক থেকে শোনা যায়, সে-সম্পর্কে গোপনে সে তাদের সতর্ক করে দেয়। এভাবে দলের বাইরে থেকেও সহানুভূতির জোরে ডাকাতির ঘটনার পর পাকা ওই গ্রুপের সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তার বিনিময়ে পুলিসি নির্যাতনের শিকার হয়ে তাকে যে-শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির শিকার হতে হয়, তা ভয়াবহ। ওই নির্যাতনের পরে মেদিনীপুর থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হলেও সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের প্রতি তার সহানুভূতির আবেগ এতটুকু হ্রাস পায় না। কালীনাথ-গ্রুপের প্রয়োজনে পাকা তার পিতার দুটো রিভলবারই চুরি ও হস্তান্তর করে। অবশ্য নির্যাতনভোগের পর সুস্থ হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়ায় নতুনমামী সুধার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে পাকার জীবনে এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হয়। দুরন্তপনার অবসান ঘটে তার। কালীনাথ ভুল স্বীকার করে পাকাকে তার গ্রুপের সদস্যপদদানের প্রস্তাব করলেও পাকা তা প্রত্যাখ্যান করে। নতুনমামীর সঙ্গে অজাচারমূলক সম্পর্কের ইঙ্গিতদানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে পাকা প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটে। নতুনমামীর সঙ্গে পাকার সমাজ-বহির্ভূত সম্পর্কে অজাচারের যে–ইঙ্গিত, তা তাদের অবচেতন মনের সুপ্ত বাসনাগুলোর প্রলম্বিত পরিচর্যারই অনিবার্য প্রস্ফুটন।

কালীনাথের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের প্রতি পাকার যে-প্রশ্নাতীত নির্ভেজাল সহানুভূতি তা মানিকেরই মর্মজাত বলে অনুমান করা যায় মানিক এ-উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের সাফল্যকে বড়ো করে দেখান নি, কিংবা এদের ব্রিটিশ-হটানোর লক্ষ্য-যে এ-ধরনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সফল হয়ে উঠবে এমন ইঙ্গিতও তিনি দেন নি— তবু এ ধরনের কর্মপ্রক্রিয়ার প্রতিই মানিকের সূক্ষ্ম সহানুভূতি উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থেকেছে। মানিক যখন এ-উপন্যাস লিখছেন তখন তিনি মার্কসবাদে পুরোপুরি দীক্ষিত। এ দেশের

মার্কসবাদীরা সন্ত্রাসবাদকে ভ্রান্তপথ বলে এর অনেক আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, মানিকের মধ্যেকার এ-সহানুভূতির উৎস কী? আমরা জানি, ব্যক্তিগত জীবনে বাঁকুড়ায় কলেজছাত্র থাকাকালে মানিক অনুশীলন দলের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু ওই গ্রুপের কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয় হন নি। ব্যক্তিগত জীবনের ওই অভিজ্ঞতার প্রায় বিশবছর পর মানিক এ-উপন্যাস রচনা করেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, মানিকের সব কটি রাজনৈতিক উপন্যাসই সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। একমাত্র ব্যতিক্রম *জীয়ন্ত* । তাহলে কি আমরা ধরে নেব, মানিক এ-উপন্যাসে অনেকটা নস্টালজিয়া-আক্রান্ত? তবে এ-কথাও ঠিক যে, নস্টালজিয়াই তাঁর এরূপ সহানুভূতির পূর্ণ ব্যাখ্যা হতে পারে না।

এক্ষেত্রে আমরা অনেক কথাই ভাবতে পারি। যেমন : এ-উপন্যাস রচনার পরিকল্পনাকালে মানিক পাকা-চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজের কলমপেষার ইতিকথা লেখার কথা ভাবলেও উপন্যাস প্রকাশের সময়ে মত পরিবর্তন করেন। উপন্যাসের নাম পরিবর্তন তারই প্রমাণ। উপন্যাসটি *পরিচয়ের* পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে বের হয় ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছরকাল ধরে। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় আরও এক বছর পরে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসটির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ পরিকল্পনা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পর্যন্ত উপন্যাসটি তিনবার পরিবর্তিত হয়। ওই সময়কালে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তনও হয়ে থাকবে। স্মরণীয় যে, তেভাগা আন্দোলনরত বাংলার কৃষকসমাজ ওই সময়কালেই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসক ও সদ্যঃস্বাধীন দেশের সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে পূর্ব ইওরোপের কতকগুলো দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে সফল হয়েছে চীন বিপ্লব। ১৯৪৮এর ফেব্রুয়ারিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে বিপ্লবাত্মক রণনীতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এমন একটি উত্তপ্ত বর্তমানকে নিয়ে উপন্যাস রচনায় নানা সমস্যা হতে পারে ভেবেই হয়তো মানিক অতীতচারী হয়েছেন। সমকালের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে বলেই হয়তো তিনি সহিংস সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডকে মহিমান্বিত করে উপন্যাস রচনা করেছেন। সে সময়ে ক্ষমতাসীন ভারতীয় কংগ্রেস দলের সরাসরি সমালোচনায় অসুবিধা, অথচ অতীতের কাহিনী অবলম্বনে কংগ্রেস-নীতির বিরুদ্ধাচরণ সম্ভবপর— এমনও হয়তো তিনি ভেবেছেন। আর এটাই হয়তো স্বাভাবিক।

তবে তিনি জনবিচ্ছিন্ন গোপন সন্ত্রাসবাদী পথকেই যে একমাত্র বিকল্প হিসেবে এ-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, তা নয়। অহিংস নীতির পরিবর্তে সশস্ত্র

প্রক্রিয়ার প্রতিই তাঁর পক্ষপাত, কিন্তু জনসাধারণকে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার গুরুত্বকেও তিনি মোটেই খাটো করে দেখান নি। সে-কারণেই এ-উপন্যাসে পাঁচুর জমিদারবিরোধী আন্দোলন ও তার কাকা জ্ঞানদাসের খাজনাবন্ধের আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। রুশ বিপ্লবের কথাও উচ্চারিত হয়েছে দু স্থানে। তবে এ-সম্পর্কিত জ্ঞান-যে সে সময়কার ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোর কাছে অস্পষ্ট, তাও স্বীকার করা হয়েছে।[৮১] আটুলিগাঁর কৃষকসমাজের খাজনাবন্ধের আন্দোলন সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> ... খাজনা বন্ধের ডাকে সর্বাগ্রে সাড়া দিয়েছিল আটুলিগাঁ, সবার আগে ছিল তার বাবা আর কাকা, সকলের চেয়ে বেশি বীরত্ব দেখিয়েছিল জ্ঞানদাস। আজও তার গায়ে পুলিসের অত্যাচারের চিহ্ন আছে, মাথায় লাঠির ক্ষত আর বাঁ উরুতে গুলির ক্ষতের দাগ। ... সারা জেলায় আর তার আটুলিগাঁয়ে খাজনা বন্ধের তোড়জোড় দেখে বসন্ত ও তার অনুগত কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী ভড়কে গিয়েছিল। তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের উৎসাহ ছিল আরও একটা ভয়ের কারণ, এর আগে কখনো তারা এভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নি। আর এমন আশ্চর্য ব্যাপার, বড়লোক নয়, নাম করা লোক নয়, গেরস্ত চাষী, ধীর সংযত ধনদাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল আটুলিগাঁর খাজনা বন্ধের নিয়ন্তা। সে যোগ না দিলে ভাগ হয়ে যেত আটুলিগাঁর চাষীসমাজ, অত প্রচণ্ড হত না আন্দোলন, মাথা তুলে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ফেঁসে যেত।[৮২]

নির্যাতনভোগী বিদ্রোহী জ্ঞানদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র পাঁচু কালীনাথ-গ্রুপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেও, রাত জেগে তাদের গোপন সভার পাহারাদার হিসেবে সততার সঙ্গে দায়িত্বপালন করলেও কিংবা ওই গ্রুপের জন্য পাকার নিকট থেকে রিভলবার সংগ্রহের কঠিনকর্ম সাধনে সফল হলেও— কেবল গোপন সন্ত্রাসবাদী কর্মযজ্ঞের মধ্যেই সে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে নি। জ্ঞানদাসের খাজনাবন্ধের আন্দোলনের গৌরবময় স্মৃতির উত্তরাধিকার পাঁচু গ্রামের যুবকদের সংগঠিত করে জমিদারের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে এক সচেতন প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধদমনে পুলিসি অভিযান শুরু হলে জ্ঞানদাস কর্তৃক পাঁচু ও দুকলিকে পুলিসি নির্যাতন থেকে রক্ষা করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। আন্দোলনে জয়ী হতে হলে তারুণ্যের উষ্ণ রক্তপ্রবাহে গতিশীল প্রতিরোধস্পৃহার সঙ্গে বার্ধক্যের অচঞ্চল অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ-যে অনিবার্য— তারই প্রতীকী পরিচর্যার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী সমাপ্ত হয়। একদিকে গোপন সশস্ত্র সংগ্রামের অব্যাহত প্রক্রিয়া, অন্যদিকে এই গণপ্রতিরোধ আমাদের সামনে এক আশার আলো রেখে যায়।

৬

স্বাধীনতার স্বাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০ জুন ১৯৫১ তারিখে। তবে এ-উপন্যাস *নগরবাসী* নামে *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৯-৫০ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নামের পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৭এর দেশবিভাগজনিত স্বাধীনতার ঠিক একবছর পূর্বে কলকাতাসহ বঙ্গভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে যে-ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, তাকেই পটভূমি করে রচিত হয়েছে এ-উপন্যাস। ওই দাঙ্গাসৃষ্টির পেছনে ব্রিটিশ শাসকদের গোপন ও সূক্ষ্ম মদদ সক্রিয় ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকচক্র যখন অনুভব করল যে, তাদের পক্ষে ভারতবর্ষের ওপর প্রত্যক্ষ শাসন অব্যাহত রাখা আর সম্ভবপর নয়, তখন এ-দেশকে দুভাগে বিভক্ত করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আঁটলো তারা। ভারতবর্ষকে দুটি পরস্পরবিরোধী দেশে বিভক্ত করতে পারলেই তাদের পরোক্ষ কর্তৃত্ব পরিচালনা সহজতর হবে— এই যুক্তিই ব্রিটিশ শাসকদের ষড়যন্ত্র আঁটতে সাহায্য করল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ওই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধানবৃদ্ধিতে সহায়ক হলো এই দাঙ্গা। দেশবিভাগেও তাই ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সহজ হয়ে গেল। অতএব ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের দেশবিভাগজনিত স্বাধীনতা কিছুদিন না যেতেই জনমানসে অর্থহীন হয়ে উঠল। কিন্তু উপন্যাসে এই অর্থহীনতার চিত্র অঙ্কিত হয় নি। তার কারণ, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা স্বাধীনতা-পূর্ব কালসীমায় বিস্তৃত থেকেছে। ফলে জনমনে স্বাধীনতা-সম্পর্কিত হতাশাবোধের কেবল ইঙ্গিতটিই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে এ-উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন অনুসরণ করে জানা যায়, ১৯৪৬এর মধ্য আগস্টে সংঘটিত কলকাতার তিনদিনব্যাপী দাঙ্গার কুৎসিত হানাহানি প্রত্যক্ষ করে তিনি কেবল ক্ষুব্ধ ও বিচলিতই হন নি, জীবনের ঝুঁকি নিয়েও দাঙ্গাদমনে অংশগ্রহণ করেছেন। সুতরাং *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাস-যে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল, তা বলা বাহুল্য।

এ-উপন্যাসেও কতক পরিমাণে *চিহ্ন* উপন্যাসের টেকনিক ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো একটি বা দুটি পরিবার বা ব্যক্তির কাহিনী হয়ে ওঠে নি এ-উপন্যাস। এখানেও অনেকগুলো পরিবার ও অনেক অনেক মানুষের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়ে বক্তব্যবিষয়কে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। বৃদ্ধ অনুকূলের পুত্র প্রণব তরুণ প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী। তারই উদার সামাজিক মনোভাবের ফল হিসেবে তাদের বাড়িতে জড়ো হয়েছে দাঙ্গাবিধ্বস্ত আত্মীয়-অনাত্মীয় পাঁচ-ছটি পরিবার।

এসব পরিবারের পুরুষ–সদস্যরা কার্য–উপলক্ষে প্রতিদিন শহরে বেরিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই নিয়ে ওই গৃহের রাতের আসরটি বেশ জমজমাট হয়। সেখানে অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং তার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতির গতিধারা মূর্ত হয়ে ওঠে। ওই বাড়িতে আশ্রিত পরিবারগুলির বাইরেও কয়েকটি পরিবার, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সভা–শোভাযাত্রা, রেশনদোকান, শুঁড়িখানা, চোরাকারবারের গুদাম, পত্রিকা অফিস প্রভৃতির আনুষঙ্গিক বর্ণনায় দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা বাস্তবতা লাভ করে।

অনেকগুলো পরিবার ও সেইসব পরিবারের মানুষকে নিয়ে এ-উপন্যাসরচিত হলেও, বিশেষভাবে একটি পরিবার ও সেই পরিবারের একটি মানুষ উপন্যাসে কিছুটা প্রাধান্য অর্জন করেছে। সুশীল ও মণিমালা এবং তাদের পুত্রকন্যা সুধীন ও আশাকে নিয়ে যে-পরিবার-সীমা, তার কাহিনী এ-উপন্যাসে তুলনামূলকভাবে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত মণিমালার অন্তর্জগতে সৃষ্ট নানামুখী দ্বন্দ্ব এ-উপন্যাসে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। মণিমালা-চরিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আত্মস্বার্থপুষ্ট সংসারী মানুষের সঙ্গে পরার্থপর মানুষের দ্বন্দ্ব, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভদ্রলোকি মুখোশের সঙ্গে মজুরশ্রেণীর স্পষ্টতার দ্বন্দ্ব কিংবা ভদ্রলোকশ্রেণীর মনোবৈকল্যের সঙ্গে বাস্তবতাবোধের দ্বন্দ্বকে এ-উপন্যাসে সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। নানা ঘাত–প্রতিঘাত ও টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মণিমালা আত্মস্বার্থসর্বস্ব জীবনভাবনা পরিত্যাগ করে কিভাবে দ্বিধাশূন্য-মানস হয়ে ওঠে এবং সেই মানস–পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দাঙ্গাবিপর্যস্ত কলকাতার অস্তিত্ব-লড়াইয়ের ঘটনাপ্রবাহ কী সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা রাখে— তারই এক নিপুণ কথাচিত্র হয়ে উঠেছে এ-উপন্যাস।

সাতবছর পূর্বে যে-মণিমালা নির্বিঘ্ন সুখের প্রত্যাশায় স্বামী-পুত্র-কন্যাসহ শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করেছিল এবং ওই দীর্ঘ সাতবছরে একমুহূর্তের জন্যও ওই গৃহে যায় নি— সেই মণিমালাকে দাঙ্গা এমন আতঙ্কগ্রস্ত ও দুর্বলমনস্ক করে ফেলল যে, দেবর প্রণবের প্রস্তাব উত্থাপনমাত্র শ্বশুরগৃহে প্রত্যাবর্তনে সে নির্দ্বিধায় সম্মত হলো। মণিমালার জন্য এ-ছিল এক অসম্ভব কল্পনা। কিন্তু মণিমালার এই পরিবর্তনে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যাবে না। দাঙ্গা-উপদ্রুত এমন একটি অঞ্চলে তাদের বাস, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত কাটে মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্য দিয়ে। তাদের উদ্ধারের জন্য সুদূর মধ্যভারত থেকে মণিমালার মামা প্রমথ এসে তাদের ঘরের সামনেই নিহত হয় দাঙ্গাকারীদের হাতে। অর্থাৎ পরিস্থিতি তৈরি হয়েই ছিল। এই ঘটনা থেকে মানিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতাকে যেমন স্পষ্ট

করে তুলেছেন, তেমনি ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তার অসামান্য প্রভাবকেও চিহ্নিত করেছেন। তবে দাঙ্গার প্রভাবে মণিমালার এটুকু মনপরিবর্তনের চিত্র এঁকেই মানিক ক্ষান্ত হন নি। তিনি অগ্রসর হয়েছেন আরও অনেক দূর। শ্বশুরগৃহে গিয়ে অনাত্মীয়, আত্মস্বার্থবিমুখ, পরার্থপর কতকগুলো পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মণিমালার গহন মনের গৃহসুখপুষ্ট বদ্ধ জলাশয়ে কী প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হলো— তার রূপনির্মাণেও মানিকের দক্ষতা প্রশংসনীয়। পারিবারিক স্বার্থলালিত মন ও পরহিতপরায়ণ নিঃস্বার্থ মনের এক যথার্থ দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়ে প্রথমেই মণিমালা অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রণব তার যথার্থ সমালোচনা করে বলে :

> অনেক বিষয়ে মিল খাচ্ছে না, এটা স্বাভাবিক। এরকম তো হবেই। তুমি এতকাল শুধু ঘরসংসার নিয়ে ছিলে, আমরা বাইরে কাজ করে আসছি, বাইরের সমস্যা নিয়ে ভেবে আসছি। তুমি আমাদের মত হবে কি করে? সোজা স্পষ্ট করে বলি, তুমি পিছিয়ে আছ, আমরা খানিকটা এগিয়েছি। এতো সত্যি কথা।[৮৩]

কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি সত্যও আছে। মণিমালা পিছিয়ে থেকেও এমন এক মানসসত্তাকে ধারণ করে ছিল— যা পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে উন্মুখ। পরিবর্তনবিমুখতা তার মনোবৈশিষ্ট্যে স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে নি। সে-কারণে "গোকুল হাসিমুখেই বলে, সে প্রমাণটাই তো দিলেন যে এত কাল চোখ-কান বুজে সংসার করেও মানুষ রয়ে গেছেন। নইলে আপনার এত জ্বালা হবে কেন? শুধু যদি আপনার মনে হত, আমাদের রকম-সকম আপনার পছন্দ নয়, সেটা আপনার মনে-মনেই থাকত। কিন্তু আপনি একেবারে ছটফট করছেন-এ তো সোজা ব্যাপার নয়। আপনার ভেতরে ওলোট পালোট চলছে। ..." [৮৪] এই মানস-আলোড়নের তীব্র তরঙ্গাভিঘাতে কিভাবে মণিমালার মধ্যবিত্তসুলভ ভদ্রলোকি বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে খসে পড়ে, বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা সেটাই মূর্ত করে তোলা হয়েছে। নিজের শ্রমজীবী সত্তার মধ্যেই-যে মানুষের প্রকৃত গৌরব নিহিত— এই আত্মোপলব্ধি বা বাস্তবতাবোধই মনিমালাকে সুস্থ জীবনান্বেষায় স্থির রাখে। গোকুলের ভাষায় : "... আপনি নিজেই বোঝেন কি তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছিলেন, নিজেকে মজুরনীর অধম চাকরাণী বলে চিনতে পেরেছেন...। "[৮৫] অতঃপর উপন্যাসের শেষে মণিমালা তার মনের মধ্যেকার সকল দ্বন্দ্বের — স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার, ভদ্রলোক ও মজুরের, পরিশ্রমজীবী ও পরশ্রমজীবী সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের— ঊর্ধ্বে উঠে যায়। স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াই করে পুত্র-কন্যাকে নিয়ে রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণ করলে সে-সভায় অনেকের মধ্যে তার কন্যা আশাও মারাত্মকভাবে আহত হয়। আশাকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেখে গৃহে

প্রত্যাবর্তনের পথে মণিমালা যে-সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করে, তাতে তার দ্বিধামুক্ত মানসের পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মণিমালার স্বীকারোক্তি :

> তোমাদের বলিনি, আজ বলছি। না বলে পারব না। স্বামী–দেবতা বড়লোক বন্ধুর চোরাকারবারের এজেন্ট হবেন, বন্ধু বাড়ী জুটিয়ে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম, যাব না। স্বামী–দেবতা নোটিশ দ্যান, না গেলে ত্যাগ করবেন, বিয়ের গয়না দান–সামগ্রী ছাড়া যা কিছু দান করেছেন সব বাজেয়াপ্ত করবেন। ...
>
> আমি ভয় পেয়ে হার মানি। পায়ে ধরে দু'টি দিনের শুধু সময় চেয়ে নিই। আজ বুঝতে পারছি, তোমরা কেন আমার চোরাবাজারে কেনা চাল খেতে চাওনি। তখন ভেবেছিলাম বাড়াবাড়ি। ...
>
> মণি বলে, মরবে কি বাঁচবে, আর তা ভাবি না। সভায় গিয়েছিল বলে হাসপাতাল থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দিলেই বা আমি করছি কি? বাপের চোরাবাজারী পয়সার ভাত–কাপড় ছুঁতে না চেয়ে মেয়েটা নিজেই ন্যাংটা হয়ে উপোস করে মরে গেলেই বা করছি কি? আমি আজ তোমার সুশীলদা'কে নোটিশ দেব গোকুল, ভাল বাড়ীতে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বজ্জাতি করার মতলব যদি না ছাড়ে আমিই ওকে জন্মের মত ত্যাগ করব![৮৬]

একদিন স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংকীর্ণ সুখস্বার্থের বিভোরতায় শ্বশুরগৃহ ত্যাগে যে ছিল অত্যুৎসাহী— সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে সুস্থ রাজনীতির আবহাওয়ায় সে-ই পরিবর্তিত হয়ে চোরাকারবারির অর্থে–পুষ্ট স্বামী–পরিত্যাগে কেমন স্থিরমনস্ক হয়ে ওঠে— মণিমালার চরিত্র উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে মানিক সেই কাহিনীকেই এ-উপন্যাসে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। এভাবে ভারতবর্ষের উত্তাল রাজনৈতিক ঘটনাধারার এক যুগসন্ধিকালীন পরিণতির প্রতীক হয়ে উঠেছে মণিমালা।

এ-উপন্যাসে মানিকের স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তার স্ফুরণও লক্ষযোগ্য। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেকার এ-সম্প্রদায়গত দাঙ্গার মূলে–যে প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক শাসকশক্তির পরাজয়ের জ্বালা সক্রিয়— নানাভাবে সে-বিষয়টি পরিষ্কার করে তোলা হয়েছে। যুগ–যুগ ধরে এদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত সৌহার্দমূলক সম্প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে অকস্মাৎ এই সংঘর্ষের কারণ তাই রাজনৈতিক ও চক্রান্তমূলক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরিকল্পনা থেকেই শাসকশক্তি এর উস্কানিদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির এই কুৎসিৎ আচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাংবাদিক গিরিনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "...যারা রাজত্ব করে,

রাজত্ব যেতে বসলে তারা ভয়ানক কাণ্ডই জুড়ে দেয়। রাজত্বের লোভ চরমে উঠে গেছে, শেষ অবস্থার বিকার কিনা!"[৮৭] কিন্তু ব্রিটিশদের এই ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেন সচেতন নয়? কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সতর্ক থাকলে এরূপ ষড়যন্ত্র তো কার্যকর করা সম্ভবপর ছিল না। ব্রিটিশ শাসকশক্তি যদি উভয়দলের সাধারণ শত্রু হয়, তাহলে শত্রুর বিরুদ্ধে দুদলের ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা। সেটা কেন হচ্ছে না? এ-প্রশ্নের উত্তরে গিরিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী প্রধান দুটি জাতীয়তাবাদী দলের শ্রেণীবিশ্লেষণমূলক মূল্যায়ন করেন। গিরিনের মতে, কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ব্রিটিশ রাজশক্তির শত্রু নয়, বরং বিপক্ষ। "...শত্রু যদি হত, আপনার সংসারের ওই নিয়মটাও খাটত, একজোট হয়ে যেত। ইংরেজ এ দেশে বিপক্ষ গড়তে দিয়েছে, কখনো শত্রুতা বরদাস্ত করেনি, শত্রুকে ফাঁসি দিয়েছে— দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্রু হয়ে উঠেছে, এখন বিপক্ষরাই ইংরাজের ভরসা ...।"[৮৮] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভূমিকার এমন সারসত্য উন্মোচনের দৃষ্টান্ত উপন্যাসের অন্যত্রও রয়েছে। গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যেকার আপস ফরমুলায়– যে জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থ নিহিত নেই, সে-বিষয়টি বামপন্থী কর্মী প্রণবের বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর কারণ, জাতীয়তাবাদী এ-দুটি দল মূলত ব্রিটিশের পক্ষপুট আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। ফলে তাদের পক্ষে ব্রিটিশদের করুণাসৃষ্ট স্বাধীনতাগ্রহণ ছাড়া জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির পথনির্মাণ অসম্ভব। প্রণব তাই বলে :

> আমার মনে হয়, আমরা ভুল করছি। গান্ধী-জিন্না আপোষ চেয়ে জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করছি। ঐ স্তরে আপোষ হবেও না সে আপোষে সাধারণ মানুষের লাভও নেই। গরীব খাটুয়ের মধ্যে খাঁটি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি আছে, ওটাই মিলনের আসল ভিত্তি করা উচিত, কংগ্রেস-লীগ মিলন নয়। কংগ্রেস-লীগ-বৃটিশ এই তিন পক্ষে আপোষ হতে পারে, কংগ্রেস-লীগ আপোষ হবে না। বৃটিশের আপোষ আদরে কংগ্রেস-লীগ দু'ভাই লায়েক হয়েছে, সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেরা লাঠালাঠি করতে পারে, বৃটিশের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, কিন্তু বৃটিশকে বাতিল করতে তো পারে না![৮৯]

কংগ্রেস-মুসলিম লীগের এই দুর্বলতার সুযোগে ঔপনিবেশিক শাসকশক্তি হিসেবে ব্রিটিশরাজ স্বার্থান্বেষী মহলের সাহায্যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য : দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও মানসিক ব্যবধান বৃদ্ধি করে স্বাধীনতার নামে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত ও দুর্বল করা। ব্রিটিশ শক্তি তাদের উদ্দেশ্য

চরিতার্থ করতে দারুণভাবে সফল হয়। ভারতবর্ষীয় শোষক, কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিসমূহ এবং পাড়া-মহল্লার গুণ্ডা-বদমাশপ্রকৃতির লোকেরা এ-কাজে সহায়ক হয়। প্রণবদের পাড়া ছিল অনেকটা শান্ত। একদিন শোনা গেল, অন্যপাড়ার গুণ্ডা ইয়াসিন এসে প্রণবদের পাড়ার গুণ্ডা সুবোধ সিংহ ও নাজের আলীর সঙ্গে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সলাপরামর্শ করে গেছে এবং সন্ধ্যার পর তিনজনে মিলে চৌরঙ্গীর বড় হোটেলে খানাপিনা করেছে। পরদিন সকালেই দেখা গেল, প্রণবদের পাড়ার মন্দিরের ঠিক সামনে পুলের ধারে সকলের পরিচিত ঘুঁটে-বিক্রেতা বৃদ্ধা নানীর মৃতদেহ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে তার সর্বাঙ্গ। অন্যদিকে মন্দিরের লোহার কলাপসিবল দরজার খাঁজে লটকানো রয়েছে একটি গরুর মাথা। দুই সম্প্রদায়ের লোকদেরকেই উত্তেজিত করার জন্য দুটি ঘটনা সাজানো হয়েছে বেশ পরিকল্পনা করে। সুতরাং পরিকল্পনাকারীদের উদ্দেশ্য বিফল হলো না। অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই পাড়ার দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে দাঙ্গা লেগে গেল :

> ... তারপর এলোমেলো মারপিট খুন-জখমের চেষ্টা চলতে থাকে, কাপড়ের ভাঁজের আড়াল থেকে ঝকঝকে ছোরা বেরিয়ে এসে রতন সান্যালের পাঁজরে ঢুকে যায়, অ্যাসিডের বাল্‌ব্ ফেটে হিন্দু-মুসলমান দু'জাতেরই কয়েকজনের কালো চামড়ার কিছু কিছু ঝলসে জ্বলে-পুড়ে ইংরেজী সাদা চামড়া হয়ে উঠবার প্রতিশ্রুতি জানায়। আচমকা কোথা থেকে অনেকগুলি লাঠি এসে হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো করে দিতে থাকে মানুষের। ...
>
> বহু নিরীহ লোক যখন হতাহত হয়েছে, লুঠপাটের চরম পালা চলছে, সদলবলে একদল উন্মাদ যখন গিয়ে বস্তিতে সাত-আটটা ঘরে আগুন দিয়েছে, চোরাবাজারে যে পেট্রোলের টানাটানি সেই পেট্রোল রাশি রাশি ঢেলে আগুন দিয়েছে, তখন দিগন্ত কাঁপিয়ে ট্রাকে চাপিয়ে মিলিটারী এল। বস্তি তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে।[৯০]

দাঙ্গার পেছনে এই হলো গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিস-মিলিটারির অবদান। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকাজে নিয়োজিত পুলিস ও সেনাবাহিনী যতদূর সম্ভব নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। তারা আবির্ভূত হয় ঘটনা ঘটে যাবার এত পরে, যখন আর কিছু করার থাকে না। দাঙ্গা চলাকালে টেলিফোনে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে একজন নাগরিকের অভিজ্ঞতার চিত্র :

> ... পুলিস আসে না কেন, সৈন্য? রসময় টেলিফোনের যন্ত্রটায় ঝাঁকি মারে, সাড়া পেয়ে ব্যাকুলভাবে আহ্বান জানায়, কিন্তু পুলিশও আসে না, সৈন্যও আসে না। জবরদস্ত বৃটিশ-রাজের সৈন্য-পুলিসের কি হয়েছে? ঘরের কোণে খেলার ঝোঁকে সাত বছরের ছেলে বন্দে মাতরম্ বললো যারা শুনতে পেয়ে তাকে সায়েস্তা করে।[৯১]

শুধুমাত্র দাঙ্গা সংঘটিত করেই গুণ্ডাজীবনের পরিতৃপ্তি সম্পূর্ণ হয় না। কিভাবে তারা ঘুঁটে-বিক্রেতা নানীর পুত্র নাজিমকে প্রতিশোধগ্রহণ থেকে নিবৃত্ত রাখে, বিনামূল্যে শস্তা মদ খাইয়ে খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে সেই সুযোগে তার সুন্দরী স্ত্রীকে ভোগ করে— তারও উন্মোচন ঘটিয়ে মানিক গুণ্ডাজীবনের বৈশিষ্ট্যকে সমগ্রতাদান করেছেন।

গুণ্ডাদের উস্কানিপূর্ণ সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডে যারা উত্তেজিত হয় নি, বরং সচেতনভাবে ওদের কার্যক্রম সম্পর্কে সতর্কতামূলক আচরণ করেছে, তারা হলো মজুরশ্রেণীর লোক। মজুররা দাঙ্গায় মোটেই অংশগ্রহণ করে নি। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে-দৃঢ় বন্ধন সেখানে শৈথিল্য আনতে পারে নি শাসকমহল ও তাদের অনুচরবর্গ : "মজুররা এ দাঙ্গায় নামে নি, তাদের বস্তিতে সহজে আগুনও লাগাতে পায় না, পালা করে দল বেঁধে তারা পাহারা দেয়। ..."[৯২] কেবল দাঙ্গায় অংশগ্রহণ না করেই তারা দায়িত্ব শেষ করে নি; দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনেও তারা সোচ্চার ভূমিকা রেখেছে। প্রণব, গোকুল ও ভূপেশদের উদ্যোগে ওদের মহল্লায় যে-শান্তিসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে যোগ দেয় বেশির ভাগ মজুর : "কারখানা-ফেরত মজুররা সন্ধ্যায় বাজারে সওদা করতে আসে, দলে দলে তারা জমায়েতে ভিড়ে যায়। দেখতে দেখতে দু'তিনশো মানুষের ছোট-সভাটা হয়ে দাঁড়ায় হাজার মানুষের জমায়েত।"[৯৩] ওই সভায় সাধারণ মজুররাও বক্তৃতা করে। তাদের বক্তব্য থেকে শ্রমজীবী মানুষের মনের মধ্যেকার দাঙ্গা-সম্পর্কিত ভাবনার প্রকাশ ঘটে আরও চমৎকারভাবে :

> এই দাঙ্গার পিছনে, ধর্মের নামে এই খুনোখুনির কি কারসাজি আছে, কাদের কারসাজি আছে, এখনো না সমঝালে গরীব মানুষকে— খাটুয়ে মানুষকে হাড়ে-হাড়ে টের পেতে হবে। তাদের কত খুন কত জান দিয়ে কারা কি বাগিয়ে নিল, তাদের নসিবে কি জুটলো। ইংরেজ বাদশা, কংগ্রেসী বড় বাবুরা আর লীগের বড় সায়েবরা উপরতলায় মরিয়া হয়ে খেলছে আপোষ লড়াই আদায়-নিকাশের ব্যবসাদারী খেলা— খেটেও যারা খেতে পায় না, তাদের জাত-ধর্ম হয়েছে এই জুয়াবাজির এক বড় চাল। মজুর চাষী গরীব ক্ষেপে গেছে, ক্ষেপে গেছে জাহাজের দেশী ফৌজ, ইংরেজ চোখে অন্ধকার দেখছে। কংগ্রেসী বড় বাবুদের, লীগের বড় সায়েবদের বুক ধড়ফড় করছে। মজুর চাষী, গরীব মানুষ একবার চোখ মেলে মাথা তুললে, নিজেদের ক্ষমতা টের পেলে, তিন পক্ষের সর্বনাশ। ইংরেজ বাদশার অবস্থা কাহিল বটে, দেশের মানুষ তাকে সাগর-পারে তাড়াবেই তাড়াবে, কিন্তু সে জয়টা যে হবে গরীব খাটুয়ের-সর্বনাশ! তার চেয়ে ইংরেজ বাদশার সাথেই আদায়-নিকাশের ঘরোয়া আপোষ ভালো।[৯৪]

প্রত্যক্ষ শ্রমদানের বিনিময়ে যাদের জীবিকানির্বাহ হয়, তাদের মনে সম্প্রদায়গত হিংসাবিদ্বেষ সৃষ্টির অবকাশ থাকে না। সে-কারণে নাজিমকে বলতে শুনি : "গরীবের জাত নেই, খাটুয়েরা এক জাত।"[৯৫] অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে বাহ্যজ্ঞানরহিত নাজিম এক রাতে ঘটনাচক্রে দুর্গার বস্তিগৃহে আশ্রয়লাভ করে;— প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পর দুর্গার মনে এ-নিয়ে কোনো ক্ষোভ সৃষ্টি হয় না। বরং একপ্রকার সহানুভূতিই তার মনের মধ্যে জাগ্রত হয়। ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এরপর নাজিম যেদিন পুনরায় তাদের বস্তিতে তার সঙ্গে দেখা করতে যায়, সেদিন দুর্গা তাকে ঘরে বসিয়ে চা-বিস্কুট খাইয়ে আপ্যায়ন করে— অন্যের চোখ এড়িয়ে তাকে বস্তি পার করে দেয়। নাজিম–দুর্গার ঘটনা দ্বারা মানিক জীবনের এ-সত্যই মূর্ত করতে চেয়েছেন যে, শ্রমনির্ভর মানব-মানবীর কাছে জাতবৈষম্য একেবারেই মূল্যহীন। তাছাড়া কেবল শ্রমনির্ভর পর্যায়েই যে-তা সীমাবদ্ধ এমনও নয়, উচ্চতর সাংস্কৃতিক বোধে উজ্জীবিত মানুষের মনেও এই উপলব্ধি সমানভাবে ক্রিয়াশীল। কবি মনসুর ও তার স্ত্রী রশৌনা তার প্রমাণ। বেঁচে থাকার জন্য সাময়িকভাবে আপসের পথ গ্রহণ করলেও কবি মনসুর ওইরকম জীবনে তৃপ্তি পায় নি। নতুন এক আত্মোপলব্ধিতে উন্নীত হয় সে। আপসের জীবনে সংকীর্ণতা-বিদ্বেষ-ক্লেদের বহ্নি তার মনকে অধিকার করে ছিল। নতুনতর অনুভবে তা নির্বাপিত হয়। অতঃপর সে এমন এক জীবনভাবনার সন্ধান পায়, যেখানে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সংক্রান্ত কোনো বৈষম্যের স্থান নেই। জীবন-মৃত্যু সম্পর্কিত এমন এক মানবীয় দার্শনিক প্রত্যয় তার মনে দৃঢ়মূল হয়, পরার্থপরতাই যার সারসত্য। মনসুর বলে :

> বাঁচার জন্য লড়াই করব, মরণকে ভয় করব, ঠেকিয়ে রাখব। কিন্তু হিসাবটা কষব সব মানুষের-মরণ বাঁচন ধরে। আমার মরণটা ঠেকাতে যদি মানুষের বাঁচার চেষ্টায় সিঁদ কাটি, সবার বাঁচাকে ঘায়েল করে নিজে বাঁচার চেষ্টা করি, তবে আমার দশা হবে মরার বাড়া। জীবন হবে রোগীর বিকার। মানে, যে জীবন শেষ হবে বলে মরণকে ভয় করছি, সেই জীবনটাই হবে পচা-গলা-জীবনের ব্যভিচার— ওটা জীবন নয়, জীবনের শত্রুতা। জীবনকে ভালবাসার জন্যই এক্ষেত্রে মিথ্যা কুৎসিৎ বেঁচে থাকার ওপর ঘৃণা মৃত্যু-ভয়কে ছাপিয়ে উঠবে।[৯৬]

মনসুরের জীবনোপলব্ধিতে আমরা অতঃপর এক অখণ্ড মানবচেতনার সুর শুনতে পাই। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'— মধ্যযুগীয় কবির এই সত্যোচ্চারণই যেন ধ্বনিত হয়ে ওঠে এ-যুগের কবি মনসুরের কণ্ঠে। আসলে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বেঁচে থাকার সত্যকে মানুষ যত নির্মম ও রূঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে পারে— স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সময়ে ততটা নয়।

তবে এই সত্যের একটি অন্ধকার দিকও রয়েছে। এমন অবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্ববোধই-যে সকল ক্ষেত্রে অধিকতর বিকশিত হবে, তা নয়। মানুষ-আকৃতির এমন কিছু অন্ধকারের প্রাণী আছে যারা এই সুযোগে পার্থিব সম্পদবৃদ্ধির লালসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে চোরাকারবারিরা অন্যতম। এ-উপন্যাসে চোরাকারবারি যতীনের যে-চিত্র আঁকা হয়েছে, তা বাস্তবসম্মত। রেশনের দোকানদার কিভাবে মুদীর দোকানের মাধ্যমে রেশনের দ্রব্যসামগ্রী চোরাবাজারে বিক্রি করে, রেশনপ্রার্থীদের ঠকানোর কী চমৎকার কৌশল বের করে রেশনদোকানের মালিক— তারও এক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। যতীনের চোরাকারবারি ব্যবসা এর তুলনায় অনেক বিশাল ও গোপন। দু-চার-দশমনের ব্যবসা তার নয়, লক্ষ মনের। এ-ধরনের চোরাকারবারি ব্যবসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো : অতি অল্পসময়ের মধ্যে দ্রুত ফুলে ফেঁপে ধনী হওয়া যায় এর ফলে। তবে মানিক শুধু এই বৈশিষ্ট্যটি চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি দেখিয়েছেন, এমন এক চোরাকারবারি বন্ধুর সাহচর্যে এসে একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অধ্যাপক পর্যায়ের লোকও অর্থলিপ্সায় কেমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে, মানবিক গুণাবলি বিসর্জন দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে সম্পর্ককেও ব্যবসায়িক মানদণ্ডে বিচার করে অধঃপতনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে যায়। মণিমালার স্বামী সুশীল তারই উত্তম উদাহরণ হয়ে আছে। মানুষের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, জীবনের অস্তিত্বভাবনা প্রভৃতির চেয়ে অর্থলালসাই যে-ব্যবসার একমাত্র লক্ষ্য, তার সঙ্গে জড়িত হয়ে একজন মানবিক মূল্যবোধসমূহ বিসর্জন দেবে— সেটাই স্বাভাবিক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রচিত এ-উপন্যাসে মানিক জীবনযুদ্ধের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মানুষ তার অন্তরতম প্রদেশে যেসব জীবনসত্যকে উপলব্ধি করে সেসবকেই মূর্ত করে তুলেছেন।

৭

সার্বজনীন উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৫২ সাল। ১৯৪৬ ও ১৯৫০এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৪৭এর দেশবিভাগের ফলে বঙ্গভাষী অঞ্চলের দু-অংশের হিন্দু-মুসলিম জনগণের বাস্তুভিটা ত্যাগের মধ্য দিয়ে এ-অঞ্চলের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম যে-ঘটনাটি ঘটে, বিশেষত বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হয়ে বিপুল সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গ-গমনের ফলে সেখানে যে-উদ্বাস্তু সংকট মারাত্মক হয়ে ওঠে— তারই পটভূমিতে রচিত হয়েছে এ-উপন্যাস। তবে উপন্যাসে ওই সংকটের বাহ্যিক রূপচিত্রণকে মানিক প্রাধান্য দেন নি। অবশ্য

পানির দামে সবকিছু বিক্রি করে একটি উদ্বাস্তু পরিবারের পূর্বপুরুষের ভিটাত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে উদ্বাস্তুদের প্রচণ্ড ভীড়, অভিভাবকহীন অবস্থায় কলকাতাযাত্রায় বিপদ-ভেবে সবিতা নাম্নী এক বালিকার বালক সেজে তার পরিবারের অভিনব অভিভাবকত্ব গ্রহণ, কিন্তু কলকাতায় আপন কাকা কর্তৃক ওই পরিবারকে গৃহদ্বার থেকেই বহিষ্কার করা, অথচ অন্য একটি উদ্বাস্তু পরিবার কর্তৃক তাদের আশ্রয়দান, শিয়ালদহ ট্রেন স্টেশনে শত শত উদ্বাস্তু পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা, কলকাতায় উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ উপন্যাসে আছে। তবু এসব ঘটনাই মুখ্য হয়ে ওঠে নি। উদ্বাস্তু সংকট মানবমনের গভীরে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, মানুষের মনে কোন ধরনের বিকার ও সুস্থবোধ জাগ্রত করেছে— তার চিত্র অঙ্কনেই মানিক অধিকতর আগ্রহ দেখিয়েছেন। ফলে এ-উপন্যাস হয়ে উঠেছে উদ্বাস্তু মানুষের মনোযন্ত্রণার চিত্ররূপ। মানিক উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন : "এই কাহিনীর মূল ভিত্তি হল সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা ভেঙ্গে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।" ফলে মানবমনের ভাঙাগড়া টানাপোড়েনের রূপাঙ্কনই-যে এক্ষেত্রে মানিকের একমাত্র আরাধ্য হয়ে উঠবে— তা বলা বাহুল্য।

ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক জীবনভাবনার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যে-বেদনা হতাশা ও যন্ত্রণা অসহনীয় অনতিক্রান্ত হয়ে ওঠে, জীবনের ঐক্যবদ্ধ রূপকল্পনায় সার্বজনীন ব্যাপকতায় তার লাঘব ঘটে— ফলে অনেককিছুই সহনীয় অতিক্রমসাধ্য ও আশাপ্রদ বলে মনে হয়। বেঁচে-থাকার প্রকৃত আনন্দের সন্ধানও মানুষ এরূপ জীবনোপলব্ধির মধ্যেই লাভ করে। নামমাত্র মূল্যে সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে পূর্বপুরুষের ভিটাত্যাগের নিরানন্দ নিয়ে মহেশ্বর-পরিবার কলকাতায় গিয়ে ওঠে। বেশ সুবিধাজনক আর্থিক স্বচ্ছলতাই তাদের ছিল। পানির দামে সবকিছু বিক্রির পরেও কলকাতায় একটি ছোট বাড়ি কিনে মাথাগোঁজার ঠাঁই করে নিতে অসুবিধা হয় নি। জমানো টাকায় বেশিদিন সংসারের ব্যয়নির্বাহ সম্ভবপর নয়— এ উপলব্ধি মহেশ্বরের ছিল। কিন্তু তাই বলে সাতপুরুষের পূজা-উৎসব বাদ দেবে— এমন কথা ভাবতেও পারে নি। ফলে পূর্বের মতোই বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে দুবছর পূজা-অনুষ্ঠান করেছে। আরও হয়তো দু-এক বছর এরকম করা সম্ভবপর ছিল , কিন্তু জামাই ও পুত্র মিলে ব্যবসার নামে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ নষ্ট করল-যে, পূজা-অনুষ্ঠান দূরের কথা সংসার পরিচালনাই মহেশ্বরের পক্ষে হয়ে

উঠল কষ্টসাধ্য। পূজা অনুষ্ঠানে অপারগতার প্রতিক্রিয়া মহেশ্বরের মনে কত তীব্র হতে পারে— তা পূর্ব থেকে অনুমান করা সম্ভবপর হয় নি। মহেশ্বরের বাড়িতে পূজা হবে না জেনে পাড়ার যুবকেরা যখন একটি সার্বজনীন পূজা-উৎসবের কথা ভাবলো এবং সেই পূজা কমিটির সভাপতি হিসেবে মহেশ্বরের নাম প্রস্তাব করলো, তখনই তার তীব্র হৃদয়যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটলো : "বাপ ঠাকুর্দার পূজো বন্ধ করলাম, তাঁরা আমায় স্বর্গ থেকে অভিশাপ দিচ্ছেন। এমন কুলাঙ্গার আমি, কোন মুখে তোমাদের পূজোয় প্রেসিডেন্ট হব? না বাবা, আমায় রেহাই দাও। আমার জ্বালা বাড়িও না।"[৯৭] পাড়ার বিবেচক যুবক পঙ্কজ মহেশ্বরের এই মর্মযাতনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। চিরাচরিত নিয়ম ও ধর্মীয় অনুশাসনে-বাঁধা একটি মন পার্থিব সম্পদ হারিয়ে জন্মভূমি থেকে উন্মূলিত হয়েও ততটা বিচলিত হয় নি, যতটা ভেঙে পড়েছে পারিবারিক পূজা-আয়োজনের ব্যর্থতায়। আসলে ধর্মীয় ও ঐতিহ্য-আশ্রয়ী সংস্কারপুষ্ট মনেরই এ-যোগ্য আচরণ। পঙ্কজের যথার্থ উপলব্ধি থেকেও আমরা মহেশ্বরের মানসিক হতাশা-যন্ত্রণার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি :

> ...সব গেছে মহেশ্বরের কিন্তু তবু সে ভাবে নি সব শেষ হয়েছে। বছরকার পূজোর পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে তাঁর কাছে বেঁচে থাকার মানেটাই শুধু শেষ হয় যায় নি, জীবনটা হয়ে গেছে ব্যর্থ, অভিশপ্ত।
>
> \+ + +
>
> নিজের জীবন যেমন মহেশ্বরের কাছে আমার জীবন, বাড়ির পূজোও তার কাছে তেমনি আমার পূজো। ঠাকুরদাদা তার বাপকে জন্ম দিয়েছিল আর দিয়েছিল এই পূজোর দায়িত্ব। শিশুকাল থেকে বাপের কাছে এই জন্মগত দায়িত্বের মানে শিখেছে মর্মে মর্মে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত নিজে পালন করে এসেছে দায়িত্ব।
>
> নিজের বাড়ির নিজের এই পূজো ছাড়া আর সব পূজো তার কাছে মিছে।
>
> মুখের কথায় বুঝিয়ে কি আজ তার চেতনা জন্মানো যায় যে তার এই হতাশা কাতরতার পিছনে আছে তারই হৃদয় মনের ক্ষুদ্র সংস্কার আর সঙ্কীর্ণতা?[৯৮]

তবে মহেশ্বরকে এই সংকীর্ণ হীন সংস্কারাচ্ছন্নতার পঙ্কে নিমজ্জিত রেখে মানিক শিল্পী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি। ওই জীবন থেকে কিভাবে তার উত্তরণ ঘটলো, কিভাবে সে আত্মকেন্দ্রিক হতাশাগ্রস্ত নিরানন্দ থেকে গোষ্ঠীজীবনের ব্যাপকতার আনন্দে স্থির হলো— তারই কাহিনী নির্মাণে মানিকের শিল্পিসত্তা পরিতৃপ্তি খুঁজেছে। মহেশ্বরের পূজা চিন্তায় যে-আত্মসুখসর্বস্ব

সামন্ত মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল, সার্বজনীন পূজা উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। পারিবারিক পূজা-আয়োজনে অপারগতার কারণে তার মনে যে-অস্বাভাবিক দুঃখবোধ জাগ্রত হয়েছিল, তার মূলে ছিল ওই অহংসর্বস্ব মূল্যবোধ। 'সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের কবলমুক্ত সার্বজনীন দুর্গোৎসবে ' ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে সে তার ভুল বুঝতে পারল। সে সভায় গেল এবং সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতেও সম্মত হলো। অতঃপর দুর্গোৎসবের শুরুতে সে হয়ে গেল একেবারে ভিন্ন মানুষ: "পূজো মণ্ডপে পাড়ার প্রথম বার্ষিকী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধনের দিন মহেশ্বরকে দেখে টেরও পাওয়া যায় না এটা তার নিজের বাড়ির সাতপুরুষের পূজো নয়— বাড়ির কর্তা হিসাবে করার বদলে পূজো কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে সে সব দেখাশোনা করছে, সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।"[৯৯]

এরূপপরিবর্তন-যে শুধু মহেশ্বরের মধ্যেই সঞ্চারিত হলো, তা নয়। মহেশ্বরের অগ্রজ পরমেশ্বর, পারিবারিক জীবনবিচ্ছিন্ন ও দায়িত্বমুক্ত পরিবেশে,একক জীবনের আনন্দেই ছিল আত্মহারা। উদ্বাস্তু জীবনের বৈচিত্র্যময় সংকট তার আনন্দসর্বস্ব জীবনকেও গভীরভাবে আলোড়িত করলো। নির্ঝঞ্ঝাট আনন্দলাভের সুখস্বার্থে বিয়ে পর্যন্ত সে করে নি, অথচ বৈরাগ্যও তার জীবনে ছিল না। কারও ক্ষতি না করে, কারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে, সকলকে হাসিয়ে নির্মল আনন্দলাভই ছিল তার জীবনের একমাত্র কাম্য। অনুজের কাছ থেকে নিয়মিত মাসে মাসে পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ পেয়ে কলকাতায় ভাড়াবাড়িতে তার জীবন বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল। কাউকে পরামর্শ বা উপদেশ না দিয়ে, কারও কোনো দায়িত্ব না নিয়ে সুখসন্ধানী তার জীবন ছিল ভারমুক্ত, পুলকবিভোর। পরমেশ্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে মানিক বলেছেন :

> লোকটি সে সন্ন্যাসী নয়। কেউ কোনদিন তাকে জপতপ পূজা অর্চনা করতে দ্যাখে নি—...
>
> বিয়ে করে নি।...
>
> নেশাও করে না।
>
> শুধু খৈনি খায়।
>
> ভোজনবিলাসী নয়। খাওয়া দাওয়া অতি সাধারণ। এবং বিশেষ কোন বাছবিচার নেই।
>
> ভোগীও নয় ত্যাগীও নয়, এ কেমন মানুষ? খায়দায় ঘুরে বেড়ায় আর দশজনের সঙ্গে হাসিমুখে মেলেমেশে— অন্তরঙ্গ না হয়ে নিছক শুধু মেলেমেশে— ...[১০০]

এই মানুষটিও উদ্বাস্তু সংকটের তীব্রতা ও ব্যাপকতার স্পর্শে, এক

শ্বাসরুদ্ধকর তোলপাড়-করা পরিবেশে ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। গভীর আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন উদ্বাস্তু বালিকা সবিতা কর্তৃক তার নিঃসহায় পরিবারের দায়িত্বগ্রহণের সাহস দেখে পরমেশ্বরকেও একদিন বলতে হলো: "আমি সহজে কাউকে উপদেশ দিই না, পরামর্শও দিই না। তোমায় দিয়ে ফেললাম।... সব শুনে বলে, কারো কোন দায় নিই না, তোমারটা নিলাম। আমার নিয়ম উল্টে যাচ্ছে তোমার বেলা...।"[১০১] পরমেশ্বরের এ-পরিবর্তন আকস্মিক নয়। মহেশ্বরের পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে একত্রবাসের মধ্য দিয়েই পরমেশ্বরের জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পূর্বের মতো নিচতলার সবগুলো ঘর দখল করে বাস করতে সে অসম্মতি প্রকাশ করেছে প্রথমেই। মহেশ্বর যখন নিচ তলায় তাকে একলা নিরিবিলি থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে পরিবারসমেত উপরতলায় চলে যায়, তখন সে বলে: "তুমি আজও আমায় বুঝলে না মহেশ্বর! এতদিন পয়সা ছিল, একতলাটা ভাড়া নিয়ে একলা ছিলাম। এখন এটা আমাদের নিজের বাড়ি, তোমাদের ওপরে পাঠিয়ে আমি ওভাবে থাকতে পারি? প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হবে না একটা খাপছাড়া অদ্ভুত অবস্থায় আছি?"[১০২] অতঃপর পরমেশ্বরের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে আরও ব্যাপকভাবে। নিজ আনন্দের নেশায়ই যে ছিল চিরকাল বিভোর তারও ভুল ভাঙে। সেও বলে : 'একলা আমার আনন্দে থাকার কোন মানে ছিল না।'[১০৩] মহেশ্বরের পারিবারিক সম্পত্তি-বিক্রির অর্থ নিঃশেষিত হওয়ার ঘটনাই পরমেশ্বরের এরূপ আত্মোপলব্ধির একমাত্র কারণ নয়। উদ্বাস্তু সংকটের সর্বব্যাপী তীব্রতা, সমগ্র পরিবারের সঙ্গে একত্রবাসের ফলে সাংসারিক সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনায় একাত্ম হওয়ার সুযোগলাভ, জামাতা সমীরের অধঃপতন, সবিতার জীবনসংগ্রাম ইত্যাদি সবকিছুই তার অন্তর্মানসে অভিঘাত সৃষ্টি করে। ফলে "সর্বদা যে মুখে থাকত হালকা আনন্দের ছাপ, ক্রমে ক্রমে সে মুখে নেমে আসে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা।"[১০৪] নতুন আত্মআবিষ্কারই পরমেশ্বরের মনে এই দৃঢ়তার সৃষ্টি করে। পরমেশ্বর বলে:

> ...আসলে আমার বৈরাগ্য আসে নি— ওই নেশার মতই একটা ভাবে বিভোর হয়ে ছিলাম। দেশ থেকে ভাই টাকা পাঠায়, আমি খাই দাই ঘুমাই আর আনন্দের নেশায় বিভোর হয়ে থাকি। শশধরের নেশা তো জমে সন্ধ্যার পর মদ পেটে গেলে—আমি সর্বদাই আমার নেশায় মেতে থাকতাম। একে স্বার্থপরতাই বলা যায়—নিছক আত্মকেন্দ্রিক।[১০৫]

পরমেশ্বর আরও বুঝতে পারে : "দশটা মানুষের জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হলে, দশজনের লড়ায়ে ভাগ নিলে জীবন বেশ জমে যায়।"[১০৬] ফলে পরিবারের

আর্থিক সংকট নিরসনকল্পে পরমেশ্বর নিজে চাকরি সংগ্রহ করে, অনুজ মহেশ্বরের জন্যও চাকরির সন্ধান করে। ভ্রাতুষ্পুত্র সাধন জীবিকা নির্বাহের জন্য সচেষ্ট হয়েছে দেখে পরমেশ্বর তাকে উৎসাহিত করে। "তারপর একদিন সকালে পরমেশ্বর মহেশ্বরকে ডাকে। বলে, মহেশ, এসো আমরা বসে একটু পরামর্শ করি। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে কি ব্যবস্থা করা যায় দেখা যাক। মহেশ্বর খাটের প্রান্তে বসে। বাড়ির পূজো বন্ধ করে তাকে সার্বজনীন পূজোর দায়িত্ব নেবার পরামর্শ অথবা নির্দেশ অবশ্য পরমেশ্বর দিয়েছিল— কিন্তু চিরকালের গা-বাঁচানো ভাব ছেড়ে দিয়ে সে নিজে থেকে যেচে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে সংসারের অচল অবস্থা সম্পর্কে— এটা মহেশ্বর কল্পনাও করে নি।"[১০৭] উদ্বাস্তু সংকট সেই অকল্পনীয় পরিবর্তনই ঘটিয়ে দিয়েছে পরমেশ্বরের জীবনমূলে।

মহেশ্বর ও পরামশ্বরের জীবনপ্যাটার্নের পরিবর্তনপ্রক্রিয়ার চিত্র এঁকে মানিক এ-উপন্যাসে তাঁর বক্তব্য-বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলেছেন। অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক সুখসন্ধানের মধ্যে যে-আনন্দলাভ, তা সাময়িক ও ভঙ্গুর; বিশেষত আত্মকৃত পাপযন্ত্রণা কিংবা বাহ্যিক ঘটনার আলোড়ন সেই সুখস্পৃহার মূলে যখন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, মানুষের জীবনে তখন নিরানন্দ হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী। সার্বজনীন মানবকল্যাণে আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই মানুষ এই নিরানন্দের সর্বাত্মক হতাশা থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। জীবনসত্যের এই রূপটিই একটু ভিন্নভাবে অঙ্কিত হয়েছে সমীরের চরিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে। মানুষ কখনও পরাভবকে মানতে চায় না; তাই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তাকে জয় করার অবিরাম প্রচেষ্টাই হয়ে ওঠে মানুষের জীবনে অগ্রসরতার চাবিকাঠি। কিন্তু ব্যক্তিমানুষ যখন সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে অগ্রসর হতে চায় তখনই সে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। আর যখন সে তার সংগ্রাম প্রক্রিয়ায় সমষ্টিগত মানুষের অংশীভূত হয়ে যায়, তখনই ফিরে পায় প্রকৃত শক্তি। মানুষ হিসেবে তার যে শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব তারও সন্ধান সে পায় সংগ্রামশীল সমাজবদ্ধ মানুষের অংশীকল্পনায়। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়ার উচ্চাভিলাষ দ্বারা তাড়িত হয়ে সমীর চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ে নেমেছিল। শ্বশুরের পুঁজির দিকে ছিল তার লোভ। চোরাকারবার ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতার অভাবে সে-পুঁজি নিঃশেষিত হতে সময় লাগে নি। তারপর সমীর কিভাবে তার মনুষ্যত্ব হারায় এবং মানবিক গুণাবলি কিভাবে একে একে বিসর্জন দেয়— তারও কাহিনী মানিক বর্ণনা করেছেন। শ্বশুরের পূজার জন্য সংগৃহীত টাকা চুরি করতে, শ্বশুরের নাম করে অন্য লোকের কাছ থেকে টাকা ঋণ করতে, শ্বশুরের কাছে ভিক্ষুকের মতো টাকা চাইতে, কিংবা প্রতি

মুহূর্তে পরিচিত লোকদের প্রতারণা করে টাকা সংগ্রহ করার উপায় উদ্ভাবন করতে সমীরের অধঃপতিত মন এতটুকু দ্বিধান্বিত বা গ্লানিযুক্ত হয় না। অন্যদিকে তার নেশাগ্রস্ত জীবন এভাবে অধোগতির শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়ে সেখান থেকে উদ্ধারেরও আর পথ পায় না। হতাশার অন্ধকারে এমনভাবে নিমজ্জিত হয় সে, আলোর পথে প্রত্যাবর্তনের মনোবলই হারিয়ে ফেলে। অবশেষে উদ্বাস্তু জীবনের প্রবলতর সংগ্রামস্পৃহাই তার মনোবল পুনরুদ্ধারে সহায়ক হয়। সমীরের স্বীকারোক্তি :

> ...কারা আমায় এই হতাশা জয় করতে শিখিয়েছে জানো?— উদ্বাস্তুরা।...
>
> ওরা আমায় শিখিয়েছে কখনো কোন অবস্থাতে মানুষের হতাশ হতে নেই— সব সময়েই আশা নিয়ে থাকতে হয়। অনেকদিন পথে পথে ঘুরেছি তো। সারাদিন পয়সা উপায়ের ফন্দি ফিকির নিয়ে ঘুরি, রাত্রে স্টেশনে ওদের মধ্যে শুয়ে থাকি। ওদের দেখি আর অবাক হয়ে যাই। যথাসর্বস্ব গেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করবে কোথায় যাবে কিছুই ঠিক নেই, কারো হয় তো একবেলা খেলে আরেক বেলা খাওয়া কোথা থেকে জুটবে জানা নেই— কিন্তু কী মনের জোর হাল ছেড়ে ভেসে যাবে না কিছুতেই, একদিন আবার সব হবে। যতদিন কষ্ট করতে হয় করবে। কেউ যদি সাহায্য করে ভাল, না করলে নিজেরাই চেষ্টা করবে উঠতে। যার যত বেশী দুর্গতি তারই যেন তত বেশী আশা, তত বেশি মনের জোর।"[১০৮]

ভদ্রলোকের মধ্যবিত্তসুলভ অহংকারকে উপেক্ষা করে এ-উপন্যাসের দুটি চরিত্র শ্রমজীবী জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছে। এর একটি চরিত্র পদ্মা, অন্যটি সাধন। বিধুভূষণের মেয়ে পদ্মা। পরিচিতজনদের পিতার কেনা নতুন গাড়ি দেখিয়ে যে আনন্দ পেত, অধ্যাপক সুরঞ্জন যাকে স্ত্রী হিসেবে পেলে ধন্য হয়ে যেত—সেই পদ্মা বিয়ে করল নিজের গাড়ির ড্রাইভার কান্তিলালকে। বিয়ের পর কান্তিলালের একার উপার্জনে যখন সংসার-পরিচালনা কঠিন হয়ে উঠল, তখন সেও জীবিকানির্বাহের তাগিদে নিজগৃহে সেলাইকর্মের দায়িত্ব নিল। এ নিয়ে এতটুকু আত্মগ্লানি নেই পদ্মার বরং এরূপ দাম্পত্যজীবনেই যেন সে প্রকৃত সুখ খুঁজে পেয়েছে। অন্যদিকে মহেশ্বরের একমাত্র পুত্র কলেজছাত্র সাধন তার শিক্ষাগ্রহণ অসমাপ্ত রেখে প্রথমে ব্যবসা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয় এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে জুতার সোল বিক্রির মাধ্যমে জীবিকানির্বাহের পথ খোঁজে। এক্ষেত্রে প্রকৃত ছিন্নমূল সবিতা তার সহযোগী। মধ্যবিত্তজীবনের অন্তঃসারশূন্যতা জীবনের প্রকৃত সংকটকালে প্রকাশ্য হয়ে পড়লে তার অর্থহীনতা যে আরও সুস্পষ্ট হয়— পদ্মা ও সাধনের জীবনই তার প্রমাণ।

সার্বজনীন উপন্যাসে রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে আসে নি। যে-বিষয় অবলম্বনে এ-উপন্যাস রচিত, অর্থাৎ কলকাতার উদ্বাস্তুসংকট, তা যদিও ১৯৪৬এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৪৭এর দেশবিভাগ— এ দুটি রাজনৈতিক ঘটনারই বিষময় ফল, তবু মানিক এ-উপন্যাসে রাজনীতি–সংক্রান্ত আলোচনা পরিহার করেছেন। ওই সংকট আর্থ–সামাজিক জীবনে কী গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো, বিশেষত মনোজগতে তার প্রভাব হলো কত গভীর ও ব্যাপক— তা দেখাতেই মানিক সচেষ্ট থেকেছেন। কেবল এ-উপন্যাসেই মানিকের দৃষ্টি পুরোপুরিভাবে অন্তর্বাস্তবতার প্রতি নিবদ্ধ। মানিকের রাজনৈতিক সক্রিয়তার কালসীমা যত বর্ধিত হয়েছে, মানিকের দৃষ্টি রাজনীতির বহির্বাস্তবতা থেকে সরে গিয়ে অন্তর্বাস্তবতায় তত বেশি স্থির হয়েছে। *সার্বজনীন* উপন্যাসের পর এ ধারারই বিস্তৃতি আমরা লক্ষ করবো।

৮

রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যতগুলো উপন্যাস রচনা করেছেন, তার সবগুলোর মধ্যেই কোনো-না-কোনোভাবে রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাবে। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনের বিশ্বাস ও শিল্পিজীবনের আদর্শের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা ব্যবধান কখনও সৃষ্টি হয় নি। সে–কারণে ব্যক্তিজীবনে রাজনীতি–আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব শিল্পিজীবনে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। সরাসরি রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত নয়, শেষ পর্যায়ের এমন উপন্যাসেও তাই কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা আমরা লক্ষ করি। *চিন্তামনি* (১৯৪৫), *আদায়েরইতিহাস* (১৯৪৭), *পেশা* (১৯৫১), *সোনার চেয়ে দামি* (১৯৫১–৫২), *ইতিকথার পরের কথা* (১৯৫২), *আরোগ্য* (১৯৫৩), *হরফ* (১৯৫৪), *হলুদ নদী সবুজ বন* (১৯৫৬) প্রভৃতি সকল উপন্যাসের ক্ষেত্রেই এ-বক্তব্য প্রযোজ্য।

বর্তমান প্রবন্ধে যে-ছয়টি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার একটি *(জীয়ন্ত)* ছাড়া বাকি সবগুলোই সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। তাছাড়া এর প্রত্যেকটি উপন্যাসই মানিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও ফল। এ কারণে এসব উপন্যাসের কোনো কোনো চরিত্রে মানিকের ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন বেশ স্পষ্ট। কিশোর মানিকের দুরন্তচঞ্চল জীবনে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির প্রতি কৌতূহল, পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে শ্রেনীভিত্তিক রাজনীতিচিন্তার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কোনো কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে। মানিক

বিশ্বাস করতেন, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত না-হলে কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবরূপ লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ জনবিচ্ছিন্ন রাজীনীতিচিন্তা শেষপর্যন্ত ফাঁকা বুলিতেই পর্যবসিত হয়। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল, জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তির নিকট শাসক-শোষকের সম্মিলিত ক্ষমতাও পরাভূত হতে বাধ্য। তাছাড়া রাজনৈতিক সংগ্রাম–আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এ-ধরনের পরিবর্তনে মানুষের নৈতিক বোধ উন্নত ও দৃঢ় হয়; ব্যাপক আশাবাদ ও সাহসের সৃষ্টি হয় মানুষের মনে। ফলে অতি দ্রুত সে তার মনের মধ্যেকার নানা কুসংস্কার ও সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা পরিহার করতে সক্ষম হয়। আত্মস্বার্থপুষ্ট মানুষ সাধারণ সংকটের আঘাতেই যেমন ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে; পরার্থপর, সকলের স্বার্থের সঙ্গে নিজ স্বার্থের সমন্বয়সাধনকারী মানুষ তেমন বিচলিত হয় না। আত্মকেন্দ্রিক জীবনের পরিবর্তে সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযুক্তিই মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বকে বিকশিত করে তোলে। অন্যদিকে পরশ্রমজীবী মানুষের পরিবর্তে পরিশ্রমজীবী মানুষের জীবনেই মানবিক গুণাবলিসমূহ বিকাশের সম্ভাবনা বেশি। মানিকের রাজনীতিচিন্তা যত পরিপক্ব হয়েছে, ততই তিনি মানুষের মানবিক গুণাবলির বিকাশ কিভাবে দ্রুত হয়, রাজনৈতিক ঘটনাবলি মানুষের অন্তর্জগতে কী অভিঘাতের সৃষ্টি করে সেদিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। স্মরণীয় যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে–তিক্ত রাজনৈতিক সাহিত্য–বিতর্কে প্রবেশ করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানিক তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন এবং অনিবার্যভাবে ওইসব বিতর্ক তাঁর মনঃপীড়ার কারণও হয়; কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো , ওই বিতর্কের তিক্ততা বা তাঁর মনোযন্ত্রণা কোনোটিই তাঁর উপন্যাসকে স্পর্শ করতে পারে নি। মানিকের রাজনৈতিক দৃষ্টির শুদ্ধতা-অভিসারী অন্তর্জগৎ-অভিমুখিতাই এর কারণ নিঃসন্দেহে। তবে মানিকের শেষপর্যায়ের উপন্যাসসমূহের শিল্পশ্রীহীনতা ও তার কারণ নিয়ে বির্তক আছে। এ-প্রবন্ধে আমরা সেই বির্তকে অংশ নিতে অনাগ্রহী। প্রসঙ্গত বলা যায়, শ্রীহানির অভিযোগ যত-না গঠনকাঠামোগত ততটা বিষয়বস্তুগত বা বক্তব্যকেন্দ্রিক নয়। মানিকের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও আদর্শগত মূল্যবোধের কোনো দীনতা বা দেউলিয়াত্ব আমরা লক্ষ করি না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক উত্তাল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ের সাক্ষী হয়ে আছে তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলো।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ *সরোজমোহন মিত্র* : '১৯৪৪-এর শেষের দিকে মানিক ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন এবং আমৃত্যু তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।' *(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮৯, পৃ ৫৩-৫৪)

যুগান্তর চক্রবর্তী : 'বর্তমান বছরেই (১৯৪৪) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য-ফ্রন্টের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।' *(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ , কলকাতা, ১৯৯০, পৃ ৬৫)

অশ্রুকুমার সিকদার : '১৯৪৪ সালের শেষের দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।' *(আধুনিকতা ও বাংলা* উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ : '১৯৮৮, কলকাতা, পৃ ৩৪৩)

সত্যপ্রিয় ঘোষ : '১৯৪৪ সালের শেষের দিকে মানিক কমিউনিস্ট পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হন।' *(প্রাক্ কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক প্রবন্ধ, *অনুষ্টুপ,* কলকাতা, শারদীয় ১৩৯২, পৃ ১৪৭)

২ *সরোজমোহন মিত্র* : 'এইরকম কয়েক মাস যাবার পর মানিকের এক বন্ধু জুটল ওরই ক্লাসের একটি ছেলে, বোধ হয় পুরুলিয়ায় বাড়ি। তখন আমাদের মধ্যে অনেক রকমের Political party ছিল—অনুশীলন, যুগান্তর ইত্যাদি।...মানিক বিকেলে প্রায়ই সেই ছেলেটির সঙ্গে বেড়াত ও অনুশীলন পার্টিকে Support করত।' *(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* প্রাগুক্ত, পৃ ৯-১০)

গুণময় মান্না : 'বাঁকুড়ায় ছাত্র অবস্থায় অনুশীলন দলের কাছাকাছি আসা সত্ত্বেও বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দেন নি।' *(জীবনে মানিক সাহিত্যেও মানিক* শীর্ষকপ্রবন্ধ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস,* কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ ১৭৩)

৩ *হীরেন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়:* '১৯৩৭ সালের আশ্বিন মাস নাগাদ সুরেন গোস্বামী এবং আমি 'প্রগতি' নামে যে সংকলন সম্পাদনা করি তাতে মুখবন্ধ লেখেন নরেশবাবু, আর কারো মনে নানা সংশয় এবং হয়তো বা কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা থাকলেও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল মহারথীকেই আমরা টানতে পেরেছিলাম।' *(তরী হতে তীর,* কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ ৩০৯)। '...'প্রগতি'তে লেখা ছিল বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের'; (*প্রাগুক্ত,* পৃ ৩১৩)

সত্যপ্রিয় ঘোষ : '১৯৩৭ সালে প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রগতি* নামক সংকলগ্রন্থে মানিকের *প্রাগৈতিহাসিক* গল্পগ্রন্থের 'প্রকৃতি' নামক গল্পটি নেওয়া হয়।' (*প্রাক্ কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক প্রবন্ধ, *অনুষ্টুপ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭)

৪ 'অফিসে কোন লোক এলেই তিনি কলম বন্ধ করে চুপ করে তার কথাবার্তা, হাবভাব সব নিরীক্ষণ করতেন। বঙ্গশ্রীর মালিক সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য আসলেও মানিক একঠায় তাকে লক্ষ্য করতেন। এতে কিরণবাবু ও সচ্চিদানন্দবাবু দুজনেই অস্বস্তিবোধ করতেন কিন্তু মানিকের তাতে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। পরবর্তীকালে মানিক তাঁর 'শহরতলী' উপন্যাসে এই সচ্চিদানন্দবাবুকে অবলম্বন করেই সত্যপ্রিয়-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।' (সরোজমোহন মিত্র।। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২)

৫ 'তাঁর ভ্রাতা সুবোধবাবু বর্তমানে সদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং বন্ধু রমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানা যায় তিনি বঙ্গশ্রীতে চাকরী করার সময়েই কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এবং সাম্যবাদ সংক্রান্ত বইপত্র পড়াশুনা আরম্ভ করেন।...রমেনবাবু বলেন, ১৯৩৮ সালেই তাঁর হাতে বুখানিনের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ গ্রন্থখানি দেখে মানিক মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে আগ্রহী হন এবং তারপর ল্যিয়েনটিয়েভের মার্ক্সীয় অর্থনীতি গ্রন্থ পাঠ করে উৎসাহী হয়ে উঠেন।' (সরোজমোহন মিত্র।। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪)

৬ 'বঙ্গশ্রীতে চাকরি করাকালীন পড়েছেন গোর্কির 'মা' গভীর অভিনিবেশে...'(*প্রাক্ কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক প্রবন্ধ, সত্যপ্রিয় ঘোষ, *অনুষ্টুপ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭)

৭ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে চাকরি শুরুর সময়কাল এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্যাবলি অস্পষ্ট। তবে তিনি ১৯৪৩ সালের কোনো-এক সময়ে যে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের চাকরি ছাড়েন, সে বিষয়টি পরিষ্কার। কিন্তু চাকরি তিনি ত্যাগ করেছিলেন, না চাকরি তাঁর চলে গিয়েছিল— তা স্পষ্ট নয়। এ-সম্পর্কেপ্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ :

ভবানী মুখোপাধ্যায় : 'মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ হওয়ার ফলেই মানিক ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের কাজটা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে সে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল কিন্তু তার ক্ষেত্র তৈরি

হয়েছিল ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের কাজ করার সময়। এই সময়েই সে প্রথম প্রগতি লেখক সংঘে যোগদান করে এবং ক্রমে পুরোপুরিভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে।' *(মানিকবন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক প্রবন্ধ, *মানিকবিচিত্রা,* বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ ১১১)

সরোজমোহন মিত্র : 'মানিক বঙ্গশ্রী পত্রিকার চাকরী ছাড়বার পর সম্ভবত ১৯৩৯ সালে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে চাকরী পান। তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার বেঙ্গল–দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগদান করেন। সম্ভবত, ১৯৪৩ সালের মে-জুন মাস পর্যন্ত তিনি এই চাকরী করেন। *(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮)

যুগান্তর চক্রবর্তী : 'বঙ্গশ্রী'–পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকরিজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে— তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগদান করেন এবং বর্তমান বছরের (১৯৪৩) শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ-বিষয়ক প্রচার ও আরো নানাবিধ বেতার-অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।' *(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫)

গুণময় মান্না : 'ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে চাকরির সময় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সংস্পর্শে এলেও তার সদস্য হন নি।' *(জীবনেও মানিক সাহিত্যেও মানিক* শীর্ষক প্রবন্ধ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস* , প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪)

স্বপন দাসাধিকারী : '১৯৪৩ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে তিনি ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৪৩–এর শেষ পর্যন্ত এই চাকুরী করেন।' (*মানিকবন্দ্যোপাধ্যায়:প্রাসঙ্গিক তথ্য* শীর্ষক প্রবন্ধ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ফ্রয়েড থেকে* মার্কস , প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৮)

সত্যপ্রিয় ঘোষ : 'তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সংস্রবে কিছুকাল ছিলেন।' *(প্রাক্ কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক প্রবন্ধ, *অনুষ্টুপ,* প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭)

৮ *চিন্মোহন সেহানবিশ :* 'তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন ১৯৪৩ সালের গোড়ায়।' *(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি*

লেখকআন্দোলন শীর্ষক প্রবন্ধ, *মানিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮)

সরোজমোহন মিত্র : 'মানিকবাবু এই সংঘে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন ১৯৪৩-এর গোড়ায়।' *(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২)

সত্যপ্রিয় ঘোষ : '১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে মানিক এই লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন— তখনো তা কিন্তু কেবল কমিউনিস্টদের প্রতিষ্ঠান ছিল না।' (*প্রাক্ কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক প্রবন্ধ, *অনুষ্টুপ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭)

৯ 'কমিউনিস্ট পার্টিতে সদস্যপদ পাবার আগে যখন তিনি উপর্যুক্ত সংঘের প্রেক্ষাপটে ছিলেন তখন তিনি স্বভাবধর্ম অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টিচরিত্র সন্দিগ্ধভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন তত্ত্বগতভাবে তো বটেই, কার্যক্ষেত্রেও। ... পর্যবেক্ষকরূপে দেখছেন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীদের বাসস্থান কমিউনগুলোকে।

এরই পরিণামে লেখা হয়ে যায় তাঁর লেখকজীবনের প্রথম পর্যায়ের শেষ উপন্যাস 'প্রতিবিম্ব'। (সত্যপ্রিয় ঘোষ, *প্রাক কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক প্রবন্ধ, *প্রাগুক্ত)*

১০. 'উত্তেজনার কথা বলতে মনে এল নৌবিদ্রোহের, রসিদ আলি দিবস বা ২৯ শে জুলাই-এর অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কথা। এসব দিনে মানিকবাবুকে দেখেছি কখনও মজুরদের মিছিলের সঙ্গে একাগ্রমনে চলেছেন, কখনও ছাত্রদের সঙ্গে জুটে রাস্তায় বসে, কখনও সংঘ অফিসে অথবা কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরে বসে তুমুল আলোচনা করছেন, কখনও বা পথচারীর কাছে জেনে নিচ্ছেন সংগ্রামের টাটকা খবর।' (চিন্মোহন সেহানবিশ।। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন, মানিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৭০-৭১)

১১ '... সারা দেশ জুড়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধাদের মুক্তি নিয়ে তখন বিপুল উন্মাদনা; কলকাতা যথারীতি ছিল আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায়, আর ১৯শে নভেম্বর ছাত্রেরা অভিযান করল নিষিদ্ধ লালদিঘির (ড্যালহাউসি স্কোয়ার, অধুনা বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) দিকে, সশস্ত্র পুলিস যথারীতি পথ রোধ করল, ধর্মতলা স্ট্রীটে চাঁদনী এলাকায় গোটা রাস্তা ভর্তি হয়ে রইল ছাত্র ও অন্যান্য নাগরিকের ভিড়ে, অভ্যস্ত কায়দায় পুলিসের গুলি চলল, ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শহীদ হলেন। এরপর দুদিনেরও বেশি সময় কলকাতার বুকে আগুন জ্বলতে থাকল। কংগ্রেস নেতারা সে আগুন নিভাবার চেষ্টায় পেরে উঠলেন না। লালদিঘির রাস্তা খুলে দিতে সরকার বাধ্য হল, আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন নায়কের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড মকুব করে দিতে হল।

সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শংরৎচন্দ্র বসু স্বয়ং ধর্মতলা স্ট্রীটে উপবিষ্ট ছাত্রদলকে ঘরে ফিরে যেতে বলে দেখলেন তারা ঐ ধরনের উপদেশ মানতে রাজী নয়। ...' (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।। *তরী হতে তীর*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০০–৫০১)

১২ 'নভেম্বরের ঘটনাকে ছাপিয়ে গোটা দেশে দুন্দুভি বেজে উঠল' ৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে অন্তত চারদিন আবার কলকাতা শহর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গ্রাস থেকে নিজেকে ছিনিয়ে রেখেছিল। এবার উপলক্ষ হল আজাদ হিন্দ ফৌজেরই আবদুর রশীদ আলির মুক্তি— ইংরেজ চেয়েছিল যাতে হিন্দুরা দাবিতে না যোগ দেয়। কিন্তু কে রোধ করবে সেদিনের জলতরঙ্গ? বাংলার মুসলিম লীগ-পন্থী 'প্রধানমন্ত্রী' হুসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি স্বয়ং বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিলেন কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে। ...' (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।। *তরী হতে তীর*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০২)

১৩ 'এই উপন্যাসে অক্ষয় নামে যে চরিত্র আছে সেই অক্ষয় মানিক নিজে। ধর্মতলার মোড়ে যেদিন ছাত্ররা পথ আটকে পুলিসের মুখোমুখি বসেছিল সেদিন মানিক ওদিকে গিয়েছিলেন রোজকার নেশার তাগিদে। সেদিনের ব্যাপার দেখে তিনি মদ না খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। ...

তারপর মানিক সত্যি কিছুদিন আর নেশা করেন নি।' (সরোজমোহন মিত্র।। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯–৭০)

১৪ ১৯৪৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির ঘটনা : 'শহরের বিভিন্ন জায়গায় পথচারী ভদ্রলোক ও দোকানীদের ধরে এনে জোর করে রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করান হয়। যারা অস্বীকার করেন, তাঁদের উপর মারপিট চলে। সৈন্যরা কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে এভাবে রাস্তা সাফ করানোর চেষ্টা করে। মানিক তাদের আদেশ অগ্রাহ্য করায় তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়।' (অমলেন্দু সেনগুপ্ত।। *উত্তাল চল্লিশ— অসমাপ্ত বিপ্লব*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ ৭২)

১৫ ১৭ আগস্ট ১৯৪৬এর ডায়েরি : 'বিকালে এ অঞ্চলে শান্তি-সভা হবে শুনলাম। খুশী হয়ে নিজে বার হলাম— যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি— মিটমাটের জন্য সভায় যেতে। মসজিদের কাছে আনোয়ার শা রোডের একদল মুসলিম স্বীকার করলেন মিটমাট দরকার— কয়েকজন উত্তেজিতভাবে বললেন, মেরে পুড়িয়ে তারপর এখন মিটমাটের কথা কেন? অন্যেরা তাদের থামালেন। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নীচে যেতে এল বিরোধিতা— হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের মিটমাট— মুসলমানরা এই করেছে, ওই করেছে। 'ব্যাটা কমিউনিস্ট' বলে আমায়

মারে আর কি! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল।'

১৮ আগস্ট ১৯৪৬এর ডায়েরি : '...K. P. Roy Lane দিয়ে বাঁক পর্য্যন্ত এসেছি— লাঠি হাতে এক ছোকরা পথ আটকে ছিল— ফের আমায় ভিড় ঘিরে ধরল। এক ছোকরা লাঠি দিয়ে মারে আর কি!— নিজেই ধমক দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করলাম। ধীর শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব না বজায় রাখতে পারলে নিশ্চয় মার খেতাম। 'শালা কম্যুনিষ্ট!' 'মুসলমানের দালাল!' রব উঠছিল চারিদিকে।' *(অপ্রকাশিতমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* প্রাগুক্ত, পৃ ৯০–৯১)

১৬ দ্রষ্টব্য : *উত্তালচল্লিশ— অসমাপ্তবিপ্লব,* অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৪

১৭ দ্রষ্টব্য : ৪।৬।৫০, ৫।৬।৫০, ১৪।৬।৫০, ৪।১০।৫০, ১৫।৪।৫৩, ১৬।৫।৫৩ ও ৮।৫।৫৪ তারিখের ডায়েরির লেখা ও ১৪ সংখ্যক চিঠি *(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭, ১৩৮, ১৪৭–৪৮, ১৮১, ১৮৩, ২০৩ ও ৩০০–৩০২)। এ সম্পর্কে অশ্রুকুমার সিকদার লিখছেন : 'এমন সময় একই শিরোনামে 'পরিচয়ে' প্রবন্ধ লিখে বিতর্কে যোগ দিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন হতে পারে, পার্টি নেতৃত্বের মতের পক্ষে একজন সৃজনশীল সাহিত্যিকের সমর্থন লিখিয়ে নেওয়া ভালো মনে করেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে এই প্রবন্ধ লেখানো হয় এবং 'আলোচনার জন্য' প্রকাশ করা হয়।' *(আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,* প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৬–৫৭)। অশ্রুকুমার সিকদারের আরও মন্তব্য : '... শেষপর্যন্ত তিনি পরাস্ত হলেন এই তিন শত্রুর (দারিদ্র্য, আসক্তি ও রোগ) যুগপৎ আক্রমণে নয়। তিনি পরাস্ত হলেন, যাদের তিনি সহকর্মী ও সহযোদ্ধা বলে জেনেছিলেন তাঁদের আক্রমণে–প্রতিআক্রমণে জর্জরিত হয়ে।...' *(আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,* প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৬)

১৮ 'দেখা গেল, একবার তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কট্টর উগ্রপন্থী বলে, আর একবার আক্রান্ত হলেন ততো উগ্রপন্থী নন বলে, তৃতীয়বার আক্রান্ত হলেন আবার উগ্রপন্থী বলে।' *(আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস।।* অশ্রুকুমার সিকদার, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৯)

১৯ দ্রষ্টব্য : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য।।* সরোজমোহন মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯–৮০

২০ দ্রষ্টব্য : *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* ২য় খণ্ড, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, দ্বি. মু. ১৯৮১, কলকাতা, ভূমিকাংশ : পৃ ছেষট্টি

২১ '১৯৪৯–৫০ সালে কমিউনিস্টদের উপর সরকারী আক্রমণ তীব্রতা লাভ করে। সেই আক্রমণের ধাক্কা মানিকবাবুর গায়েও এসে লাগে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ

দেওয়ার অপরাধে বহু প্রকাশকের দরজা মানিকের কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়।' *(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য।।* সরোজমোহন মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮)

২২ দ্রষ্টব্য : *উত্তাল চল্লিশ— অসমাপ্ত বিপ্লব।।* অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৬

২৩ দ্রষ্টব্য : *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* প্রাগুক্ত, পৃ ১২৭

২৪ 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসটি ১৯৪৩ সালে শারদীয় যুগান্তর-এ এবং ওই বছরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *দর্পণ* উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। *দর্পণ* উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক জানাচ্ছেন : 'প্রায় তিন বছর আগে উপন্যাসটি পাটনার একটি মাসিকে মাসে মাসে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। অন্য নাম দিয়েছিলাম। কিছুদিন লেখার পর নানা কারণে লেখা বন্ধ করি। অসমাপ্ত বইখানা সম্পূর্ণ করে *দর্পণ* নাম দিয়ে প্রকাশ করলাম।' লেখকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ১৯৪২ সালে ভিন্ন নামে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অসমাপ্ত উপন্যাসটিই *দর্পণ* নামে পরে প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে *প্রতিবিম্বের* পূর্বে *দর্পণ* রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু *দর্পণের* ওই রূপটি ছিল অসমাপ্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে লেখক এটিকে নতুনভাবে (নামসহ) বিন্যস্ত করেন। সে-অনুমান থেকেই *প্রতিবিম্বকে* (কেবল গ্রন্থাকারে প্রকাশের কাল ধরে নয়) প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস বলা হয়েছে।

২৫ দ্রষ্টব্য : *উত্তাল চল্লিশ-অসমাপ্ত বিপ্লব,* অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ২০

২৬ *মানিক গ্রন্থাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, তৃ. স. ১৯৭৮, কলকাতা, পৃ ৪০৩

২৭ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেই পরে (১৯৪৮এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে) আত্মসমালোচনা করে বলে : '...১৯৪৩ সালের শেষাশেষি পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পার্টির অগ্রগতি থমকে যায়। এই নিশ্চলতার কারণ, সাধারণ মানুষ পার্টির মধ্যে আগেকার সেই সংগ্রামী চরিত্র আর খুঁজে পাচ্ছিল না।' *(উত্তাল চল্লিশ-অসমাপ্ত বিপ্লব।।* অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১)

২৮ *মানিক গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,* প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৭

২৯ *প্রাগুক্ত,* পৃ ৪০৬

৩০ *প্রাগুক্ত,* পৃ ৩৯১

৩১ *প্রাগুক্ত,* পৃ ৩৯৬

৩২ *প্রাগুক্ত,* পৃ ৪০৪

৩৩ *প্রাগুক্ত,* পৃ ৪০৫

৩৪ *প্রাগুক্ত,* পৃ ৩৯৫

৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪১১

৩৬ *প্রাগুক্ত*

৩৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৯৮

৩৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪২৪

৩৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৩০

৪০ পত্রিকায় এ-উপন্যাসের খুব অল্প অংশই প্রকাশিত হয়, তাছাড়া লেখকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, উপন্যাসটি ছিল অসমাপ্ত, নামও ছিল ভিন্ন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নতুন করেই উপন্যাসটি আবার লেখেন, ফলে নামও পরিবর্তন করেন। সুতরাং নতুনভাবে লেখার সময় মানিকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির যে-পরিবর্তন ঘটেছে উপন্যাসে তা প্রতিফলিত হবে— সেটাই স্বাভাবিক।

৪১ *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, রণেশ দাশগুপ্ত, দ্বি. স. ১৯৭৬, ঢাকা, পৃ ১৮৭

৪২ দ্রষ্টব্য : *মানিক গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড*, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ ১১০

৪৩ রঙ্গা ধীরে ধীরে বলে, 'খালি গাইয়ে বাজিয়ে আলসে লোক তা জানতাম না। দেশের কাজে অ্যাতটুকু ঝোঁক নেই। আপনি যেমন খাঁটি লোক খোঁজেন, ও তেমনি বলে ঝগড়া করেছিলাম না আপনার সঙ্গে? ও ঠিক তার উল্টো। দশজনকে দিয়ে কিছু করাবে দূরে থাক, নিজে কখনো কিছু করবে না। আপনি সভা করলেন সেদিন খালপারে, কত বললাম নিয়ে যেতে। বললে পিত্যয় যাবেন। হেসে উড়িয়ে দিলে, ও সভাটভা নাকি সব বাজে হাঙ্গামার ব্যাপার। সিদ্ধি খেয়ে হৈ চৈ করলে দুগ্‌গাদির সোয়ামীরসাথে।' (*মানিক গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬)

৪৪ *মানিক গ্রন্থাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৪

৪৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৩৮

৪৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪৬

৪৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫০

৪৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১০

৪৯ *মানিকগ্রন্থাবলী*, *ষষ্ঠ খণ্ড*, বিশেষ সংস্করণ : ১৯৭৪, কলকাতা, পৃ ১১১

৫০ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৭

৫১ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩৯

৫২ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৪

৫৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪১

৫৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪২

৫৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৩

৫৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪৪

৫৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪৬

৫৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৩-১৪

৫৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭০

৬০ *প্রাগুক্ত*

৬১ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭১

৬২ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮০

৬৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১০৮

৬৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৮৭

৬৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫৩

৬৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫৪

৬৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫৫

৬৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯০

৬৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৮

৭০ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৭

৭১ এসব তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে মালিনী ভট্টাচার্যের 'ইতিকথার পরে : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন পর্যায়ের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে (দ্র. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস*, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৯-১৫৯)

৭২ *মানিক গ্রন্থাবলী সপ্তম খণ্ডে* (কলকাতা।। বিশেষ সংস্করণ : ১৯৪৭) সংকলিত *জীয়ন্ত* উপন্যাসের অন্তত দু-স্থানে সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালীনাথদের সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ ভুবনের বাড়ি থেকে লিটন মেমোরিয়াল হল নির্মাণ উপলক্ষে সংগৃহীত চাঁদা ছিনতাইয়ের যে-পরিকল্পনা করে, সেটা ১৯২৬ সালের ঘটনা : 'এ তো মোটে ছাব্বিশ সাল' (পৃ ১৩৯)। ওই সময়ে উপন্যাসের নায়ক পাকা নবম শ্রেণীর ছাত্র। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে পাকা ও পাঁচু ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তির কথা যখন ভাবছে তখনকার সময়কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'এই সাতাশ-আটাশ

সালের দেশ জোড়া দুর্দ্দিনে এদেশের কোন ছেলেবুড়োর আলাপে এসব কথা না উঠে পারে?' (পৃ ২০৬)

৭৩ ১৯৫৫ সালের ১০ মার্চের ডায়েরি-লিখনে রয়েছে : 'ডাক্তার মুখার্জি গ্লুকোজ দিতে এসে জানালেন— রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে— গনো, সিফি দুটোই নেগেটিভ।

এটা সুসংবাদ। প্রথম বয়সের সেই হৈ চৈ করার দিনগুলির কথা মনে করে একটু ভাবনা ছিল বৈকি?' *(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* প্রাগুক্ত, পৃ ২৪০)

৭৪ শুধু মেদিনীপুর-বাঁকুড়াই নয়, টাঙ্গাইল-জীবনের প্রতিফলনও লক্ষ করা যাবে। এর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো : পাকার বন্ধু নরেশের মতো মানিকেরও টাঙ্গাইলে নরেশ নামেই এক বন্ধু ছিল। পাকার সঙ্গে নরেশের সম্পর্কের যে-বৈশিষ্ট্যের কথা উপন্যাসে রয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনে মানিকের সঙ্গে নরেশের সম্পর্কের ধরনেও তার হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালের ১২মের ডায়েরি-লিখন : 'চারটের পর টাঙ্গাইলের সেই বাল্যবন্ধু নরেশ, সঙ্গে আপিসের আরেকজন। সহপাঠী ও বন্ধু হলেও নরেশ ছিল আমার পরম ভক্ত, প্রেমে পড়া মেয়ের মত আমায় ভালবাসত। একটু মিষ্টি কথা, একটু দরদ পেলে কৃতার্থ হয়ে যেত।' (অপ্রকাশিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৩)

৭৫ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস,* প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১–৪২

৭৬ এ-উপন্যাসে ভৈরব ও ভুবনের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচনে জেতার প্রতিযোগিতা বেশ ঘৃণ্যরূপ ধারণ করে। ভুবন ভৈরবকে সামাজিকভাবে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে ভৈরবের ভাগ্নে পাকার একটি সামান্য অপরাধের ঘটনাকে সাজিয়ে মারাত্মক রূপ দিয়ে বিচারসভার আয়োজন করে। শহরের চামারপট্টিতে আগুন লাগা, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি ঘটনা এই প্রতিযোগিতার কারণেই ব্যাপকতা লাভের সুযোগ পায়।

৭৭ *মানিক গ্রন্থাবলী, সপ্তম খণ্ড,* প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩

৭৮ *প্রাগুক্ত,* পৃ ৭০

৭৯ *প্রাগুক্ত,* পৃ ৫৫

৮০ *প্রাগুক্ত,* পৃ ৫৬

৮১ ক. রুশ বিপ্লব সম্পর্কে কালীনাথের উপলব্ধি : 'মনটা তার নিজের দেশেই আবদ্ধ। জগতেও যে বিপ্লব ঘটছে এ ধারণাও তার নেই। রাশিয়ায় যে সার্থক বিপ্লব ঘটেছে অল্পদিন আগে তার কোন মানেই সে বোঝে নি। প্রাণটা শুধু তার ব্যাকুল হয়েছে।

রাশিয়ায় বিপ্লব হল, সে এদেশে বিপ্লব করতে পারল না, সে একা!' *(মানিক গ্রন্থাবলী, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৮০-৮১)*

খ শ্যামল জানা বলে : 'রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছে শুনেছ নিশ্চয়? মস্ত এক সাম্রাজ্য শেষ হল, অসংখ্য মানুষ স্বাধীন হল। নিজের দেশের উপরতলার গোটা কত লোকের শাসনও ওদেশে বরবাদ হয়ে গেছে। সারা দেশটা খাটুয়ে জনসাধারণের। ওরা যে ফিলজফিটা নিয়েছে তাই কিছু কিছু পড়ছি। ...' *(মানিক গ্রন্থাবলী, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭)*

৮২ *মানিক গ্রন্থাবলী, সপ্তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬*

৮৩ *মানিক গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৬*

৮৪ *প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৭*

৮৫ *প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৭*

৮৬ *প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬৪*

৮৭ *প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৬*

৮৮ *প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭*

৮৯ *প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩৮*

৯০ *প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৪-৫৫*

৯১ *প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৪*

৯২ *প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৮*

৯৩ *প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৮*

৯৪ *প্রাগুক্ত*

৯৫ *প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৭*

৯৬ *প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭০*

৯৭ *মানিক গ্রন্থাবলী, নবম খণ্ড, কলকাতা, বিশেষ সংস্করণ : ১৯৭৪, পৃ ১৩৫*

৯৮ *প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৬*

৯৯ *প্রাগুক্ত, পৃ ১৪২-৪৩*

১০০ *প্রাগুক্ত, পৃ ১১-১২*

১০১ *প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪*

১০২ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫২

১০৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭৯

১০৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮১

১০৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮০

১০৬ *প্রাগুক্ত*

১০৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৮২

১০৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫৯